১৯৭৫ : বাকশাল

একদলীয় আওয়ামী দুঃশাসন ও গণতন্ত্রের কবর।।
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব

১৯৭৫ : বাকশাল
একদলীয় আওয়ামী দুঃশাসন ও গণতন্ত্রের কবর।।
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব

তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৭৫ : বাকশাল
একদলীয় আওয়ামী দুঃশাসন ও গণতন্ত্রের কবর।।
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	সূচনা বক্তব্য ।।	০১
২.	আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ।।	০২
৩.	মেজর জিয়াউর রহমান।।	০৩
৪.	তাজউদ্দিন আহমদ।।	০৩
৫.	শেখ মুজিব তাজউদ্দিনকে সন্দেহ করতেন।।	০৪
৬.	বাকশাল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে বাংলাদেশের অবস্থা।।	০৪
৭.	ভোট ডাকাতির শুরু ১৯৭৩।।	১০
৮.	দলীয় আন্তঃকলহ।।	১১
৯.	তৎকালীন কিছু পত্রিকার শিরোনাম দেখে নেয়া যাকঃ	১৪
১০.	১৯৭৩-৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাকশাল ও আওয়ামী দুঃশাসনের আরও কিছু উলেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলঃ	১৪
১১.	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গ্রেফতার।।	১৬
১২.	রাশিয়ান লেখক ভ্লাদিমির পুচকভ মুজিবের শাসনামলের রক্তাক্ত এসব ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন	১৭
১৩.	সেই সময়ের কিছুটা সমাজ-চিত্র পাওয়া যায় রাজনীতিবিদ আবদুল হকের লেখাতেও-	১৭
১৪.	৭৪ এর দুর্ভিক্ষ।।	১৮
১৫.	জাসদ ও গণবাহিনী।।	১৯
১৬.	বাকশাল প্রতিষ্ঠা।।	২০
১৭.	চারটি পত্রিকা বাদে দেশের সবক'টি সংবাপত্র বিলুপ্ত।।	২২
১৮.	ইয়াহিয়ার এলএফও এবং শেখ মুজিবের ৪র্থ সংশোধনী।।	২৩
১৯.	বাকশাল সম্পর্কে সিরাজ শিকদারের মন্তব্য।।	২৪
২০.	এম এ জি ওসমানী।।	২৪
২১.শেষ কথা।।		২৬
২২.পরিশিষ্ট-		২৭-৪৬

১। 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কর্তৃক পেশকৃত বক্তব্য।

২। সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী ও বাকশাল- (১৯৭২ সালের সংবিধান এবং ৪র্থ সংশোধনী)

৩।"চতুর্থ সংশোধনী ছিল সংবিধান পরিপন্থী"- (মিজানুর রহমান খান)

৪।বাংলাদেশের সংবিধান (৪র্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫-(১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)

১৯৭৫ : বাকশাল
একদলীয় আওয়ামী দুঃশাসন ও গণতন্ত্রের কবর।।
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব

সূচনা বক্তব্য ।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে ফ্যাসিবাদী একদলীয় শাসন চলছে তা মূলত শুরু হয়েছে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বয়ান করতে গিয়ে কখনো সবচেয়ে গৌরবান্বিত অধ্যায়কে হাজির করা হয়েছে কলঙ্কিত ঘটনা হিসেবে, আবার কখনো কখনো প্রকৃত কলঙ্কিত ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে। এই যে ডাহা মিথ্যাচার করে ইতিহাসকে নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার করা হয়েছে, এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হল- এই বিকৃত ইতিহাসকে সত্যের আলোকে পুনঃলিখন করা। দার্শনিক জর্জ সান্তায়না বলেন, "History is always written wrong, and so always needs to be rewritten."

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগঃ রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান

একক জাতীয় রাজনৈতিক দল

১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক বাংলা পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠা

আমরা এখানে বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ কীভাবে বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটায় সেই প্রকৃত ইতিহাসটিই সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। স্বাধীনতা উত্তরকালের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ এখানে অতি সংক্ষেপে হাজির করা হয়েছে যাতে বাকশালের পটভূমিটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। এই পুস্তিকায় বাকশাল নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিদগ্ধজনের গবেষণামূলক লেখনী থেকে অনেক তথ্য সংকলিত হয়েছে। বাকশাল একটি আওয়ামী ঐহিত্য। আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তখনই তারা এই ঘৃণিত বাকশালী আদলে দেশকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করেছে। আর এটা করতে গিয়ে বাকশাল, বাকশাল প্রণেতা ও বাকশালী নেতাদেরকেও ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের (চতুর্থ সংশোধনী) আইন গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর ফলে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই দলের নাম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। সংবিধানের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এটা একটা মারাত্মক আঘাত বলে অনেকে মনে করেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের উপর যে ক্ষমতা

অর্পণ করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয় এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ সংবিধান করে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক আদালত ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়, রাষ্ট্রপতিকে অস্বাভাবিক রকমের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং কোনরূপ চেক ও ব্যালান্সের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। বিরোধী দলের আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে মাত্র ১১ মিনিটে অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর শেখ মুজিব এমপিদের বললেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান (বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনায়ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন)। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট-এখন খেয়ালখুশী মত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন। এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি জাতীয় দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল। যদি কোনো এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ।।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের মধ্যে চলছিল চরম অভ্যন্তরীণ কোন্দল। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের আজ যে বয়ান আমরা দেখি তা ১৯৭১ সালে কিন্তু এমন ছিল না। মূলত মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে তথা আন্দোলন সংগ্রামের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও দলটি ছিল চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে স্বাধীনতার ঘোষণাসহ নানা বিষয়ে আলাপ করতে গেলে দেখা যায় যে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তখন স্বেচ্ছা বন্দিত্বের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই বিষয়ে তাজউদ্দিন কন্যা শারমিন আহমদের বই থেকে জানা যায়- "পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকুর স্বেচ্ছা বন্দী হওয়ার এই সব প্রস্তুতি দেখার পরও আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় এক দেড় ঘন্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে মুজিব কাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তার এই সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন"।[১]

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকেই জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সেই অবস্থানের ফয়সালা আজও ইতিহাসে অসম্পন্ন। এরপর ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল, মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আওয়ামী লীগের দৃশ্যমান সরাসরি বিচরণ ছিল বলতে গেলে শূন্য। শহীদ জিয়ার ঘোষণাতেই এই সময় বাংলাদেশের মানুষ ও সশস্ত্র বাহিনী জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগে যে বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব ছিল, বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে শেখ মুজিবের আমল নিয়ে লেখা মওদুদ আহমেদের গ্রন্থে, "এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের দিন থেকেই বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল এক প্রতিবিপ্লবের শিকার। এটা এই অর্থে যে, দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করেননি, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারাই"।[২]

১. তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৯।
২. বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, অনু: জগলুল আলম, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩

মেজর জিয়াউর রহমান।।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা হয় খোদ সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে- সেটাই ইতিহাস। আর সেই সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের নেতা হিসেবে ইতিহাস তখন আবিষ্কার করেছিল পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত মেজর জিয়াউর রহমানকে। যে রাজনৈতিক দল এখন মুক্তিযুদ্ধের ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একক চেতনার দাবিদার বলে সোচ্চার ঐ সময় সে সকল পলায়নপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, যখন কাণ্ডারিহীন জাতি চরম হতাশায় দিশেহারা, ঠিক সেই সময় ইতিহাসের এই গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি পরিবার পরিজনের ভাবনা উপেক্ষা করে নিজের জীবন বাজি রেখে "We Revolt" বলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। হত্যা করেছিলেন তারই কমান্ডিং অফিসার জানজুয়াকে। এই বিদ্রোহ সফল না হলে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত জেনেও সেদিন জিয়াউর রহমান এই অসাধারণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কই কোনো রাজনৈতিক নেতা কিংবা অন্য কোন সামরিক কর্মকর্তা তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তখন সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেননি।

জিয়ার ঘোষণাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের তূর্যধ্বনি : টাইমস অব ইন্ডিয়া

এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।[৩]

তাজউদ্দিন আহমদ।।

তবে কিছু পরে হলেও আওয়ামী লীগের সেই নেতৃত্বহীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আবির্ভূত হন শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ। তার প্রধানমন্ত্রীত্বে ও বাকি জাতীয় তিন নেতার নেতৃত্বে মেহেরপুরের তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। কিন্ত অস্থায়ী সরকারের শুরু থেকেই নানাভাবে অন্তঃদলীয় কোন্দলের শিকার হয় আওয়ামী লীগ। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন,

কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তাজউদ্দিন আহমদ ত্বরিৎ তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালান

৩. তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ২০১৪, ৪০০

এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করে আবদুস সামাদ আজাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[৪]

কিন্তু যুদ্ধকালীন নানাবিধ ঘটনার কথা পরোক্ষভাবে শুনলেও সম্যক সময়ের অভিজ্ঞতা, প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধকালীন চড়াই উৎরাই, ঘটনা প্রবাহের মোড়, ভিতরের কথা এবং প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য সম্পর্কে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারেই থেকে যান।

শেখ মুজিব তাজউদ্দিনকে সন্দেহ করতেন।।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় ভারতের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও তাজউদ্দিন আহমদসহ সিনিয়র নেতাকর্মীদের মধ্যে যারা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছিলেন ও মুক্তিযুদ্ধ গাইড করেছিলেন তাদের তিনি সন্দেহ করতেন, এমনকি তাদের অনেককে তিনি হিংসা (jealous) করতেন। ভারতের সাথে তার বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও তাজউদ্দিন আহমেদসহ আরও অন্য নেতা-কর্মীদের ভারতের সাথে গভীর আঁতাতকে তিনি কখনোই পছন্দ করেননি। ভারতের সাথে মিশে তার দলের নেতা-কর্মীরা তাকেই গদিচ্যুত করতে পারে- শুরু থেকেই এমন শংকায় ছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম মিশন প্রধান জে এন দীক্ষিত লিখেছেন,
"He was suspicious, even jealous, of his senior party colleagues who constituted the Mujibnagar Government and guided the liberation war"[5]

এর পরের দিনগুলোতে তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বন্দ্ব আর মোটেও অস্পষ্ট থাকেনি। এবং এটা ইতিহাস স্বীকৃত। খোদ আওয়ামী লীগের সমর্থকগোষ্ঠীর নানা রচনাতেই এসকল তথ্য উঠে এসেছে। তাছাড়া চার যুব নেতা- মনি, রাজ্জাক, তোফায়েল ও সিরাজুল আলম খান'দের সাথেও মূলধারার আওয়ামী লীগের ছিল দূরত্ব যা পরবর্তীতে জাসদের জন্ম দেয় এবং স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। আওয়ামী লীগ থেকেই জন্ম হয়- আওয়ামী বিরোধী রাজনৈতিক দলের। এই বিরোধের জের ধরেই শুরু হয় নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি। আহমেদ মূসা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

"রাজনৈতিক হত্যা প্রধানত হয় বিরোধী দলকে নিঃশেষ করার জন্য। সব হত্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকে না। শাসক দলের স্থানীয় নেতারাই সাধারণত স্থানীয় প্রতিপক্ষকে শেষ করে ফেলার জন্য কাপুরুষের মতো হত্যার পথ বেছে নেয়। আবার একই দলের মধ্যে প্রতিপক্ষকে শেষ করার জন্যও খুনোখুনি হয়। বাংলাদেশে এই ঘটনাও অনেক আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যেই আগরতলা মামলার আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে হত্যা করা হ'ল। এখানে খুনী এবং যাকে খুন করা হলো উভয়পক্ষই আওয়ামী লীগের"।[৬]

মূলত এসকল গভীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত ও কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। জন্ম হয় বাকশালের।

বাকশাল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে বাংলাদেশের অবস্থা।।

আওয়ামী লীগ প্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেশে যে অবস্থা বিরাজ করেছিল আর আজ স্বাধীন

৪. বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, অনু: জগলুল আলম, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪
5. JN Dixit 223
৬. ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমেদ মুসা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৩৪

তার পঞ্চাশ বছর পরে এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে তার মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত মিল। নিচের অনুচ্ছেদটি লক্ষ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন আওয়ামী লীগ তার স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে এতোদিনে এক বিন্দুও সরে নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও কোন পরিবর্তন হয় নাই।

"আপনি বা আপনারা চাচ্ছেন যে আমি সত্য কথা লিখি, অথচ আপনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে চোখের সামনে হত্যাকাণ্ডকে আজ আর হত্যাকাণ্ড বলে প্রকাশ করার পরিবেশটুকু থাকছে না। আমি আমার চোখের সামনে অফিস প্রাঙ্গণ হতে হাইজ্যাক (বর্তমানে গুম) করে নিয়ে যাওয়া একটি বিপর্যস্ত মানুষের জন্য লিখতে পারছি না। আমি চিৎকার করে বলতে পারছি না যে দিনে দুপুরে একটি মানুষ হাইজ্যাক হয়ে গেল। কারণ আদালত তো আজ তার সেই পুরোনো জনসন রোডে নয়। আজ স্টেনগান, ব্রেনগান আর এলএমজিই সব কিছুর দায়িত্ব নিয়েছে.....।

যে খেলা আপনারা শুরু করেছেন, সে খেলাতো সত্যকে হত্যা করার খেলা। একই সাথে সত্যকে হত্যা করবেন আর সত্যের প্রার্থনা করবেন তাতো হতে পারে না। আপনাকে একটা বেছে নিতে হবে। নইলে আপনার চেয়ে শক্তিশালী হাইজ্যাকার একদিন আপনাকেই হাইজ্যাক করবে। কারণ একই কাজের দুই রকম ফল হতে পারে না"।[৭]

এই লেখাগুলোতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সময়ের নিপুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কেবল তারিখ মুছে পড়লেই মনে হয় আজকের বাংলাদেশের চিত্রই যেন উঠে এসেছে। কারণ আজকের বাংলাদেশও একই রকম নৈরাজ্য, গুম, খুন, ভীতি, আতংক আর মহাসংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়েও চরম নৃশংসতা চলছে বর্তমানে।

ইতিহাসের আলোকে একবার দেখে নেয়া যাক সেই সময়ের ঘটনাগুলোকে। নিম্নে এ সকল বিষয়ে বিদগ্ধজনের লেখা হতে কিছু উদ্ধৃত করা হ'ল:

"... শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা এবং জাতির পিতার পরিচিতি নিয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সনে ঢাকায় আসেন। উল্লেখ্য তিনি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ অবধি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে আলোচনা চালিয়ে গেছেন। তিনি স্বাধীনতা চাননি। তরুণেরা তারুণ্যবশে আবেগ-বশবর্তী হয়ে স্বাধীনতার দাবি ও সঙ্কল্প তাকে দিয়ে জোর করে তার মুখে উচ্চারণ করিয়েছিল তার আপত্তি ও পরিব্যক্ত অনীহা সত্ত্বেও। তার বাড়িতেও ওরাই স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিল তার হাতেই। মানুষের বিশেষ করে বাঙালীর স্বভাব হচ্ছে হুজুগে। তাই তারা কাক-শিয়ালের মতো বুঝে না বুঝে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মেনে নিল। সেভাবেই তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিবেদন করল।

শেখ মুজিব কিন্তু তার দলের লোকদের নিয়ন্ত্রণে ও শাসনে অনুগত রাখতে পারলেন না। তার রক্ষীবাহিনীর, তার অনুচর, সহচর, সহযোগীর লুণ্ঠনে, পীড়ন-নির্যাতনে, অত্যাচারে, শাসনে-শোষণে দেশে দেখা দিল নৈরাজ্য, প্রতিষ্ঠিত হল ত্রাসের রাজত্ব। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, মরল লক্ষাধিক মানুষ। এ সুযোগে উচ্চাশী মুশতাক ও অন্যরা হল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অস্থিরচিত্ত ও অনভিজ্ঞ রাজনীতিক নীতি আদর্শেও হলেন অস্থির। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে তার মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগের একটি উচ্চাশী ক্ষুদ্রদল তাকে সপরিবার-পরিজন হত্যা করল।

৭. ৬/১২/৭২ সালে দৈনিক বাংলায় প্রখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেন "অনিকেত" নামে একটি কলামে এই কথাগুলো লিখেন। পরে এটা তার আলোচিত বই, "স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" তে স্থান পায়। পৃষ্ঠা-১৫

সম্ভবতঃ শেখ মণিই ভাবী শত্রু তাজউদ্দীনকে মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মুজিবের কান-মন ভারী করে তাকে পদচ্যুত করিয়েছিল। রাজত্বটাও প্রায় পারিবারিক হয়ে উঠেছিল - সৈয়দ হোসেন, সারনিয়াবাদ, শেখ মণি, কামাল, জামাল তখন সর্বশক্তির আধার কার্যত।

আজো শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধই শহুরে চাটুকারদের ও স্থূলবুদ্ধির লোকদের মুখে সগর্ব-সগৌরব উচ্চারিত। এর মধ্যে দেশ-মানুষ নেই। স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী স্বভাষী স্বজনের শাসনে মানুষ স্বাধীন হয় না। মৌল মানবাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেই কেবল ব্যক্তি মানুষ স্বাধীন হয়। ভাত-কাপড়ে জন্মগত অধিকার পেয়ে দেহে-মনে-মগজে-মননে স্বাধীন থেকে জীবনযাপনের অধিকারই স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা চাইতে শেখেনি আমাদের মানুষ"।[৮]

"... দশ তারিখ ভোর ৮টায় শেখ মুজিব দিল্লী পৌঁছেন এবং বেলা দেড়টায় ঢাকা আসেন। বিমান-বন্দরে সুবিশাল জনসমুদ্র তাহাকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি ওইখান হইতে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আসিয়া জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় দৃঢ়কণ্ঠে কল্পিত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন - তাহাদিগকে নির্মূল করিবেন, নিঃশেষ করিবেন - এমনি ধরনের ভীতিজনক ভাষা ব্যবহার করেন।

রাত্রে তাহাকে ফোন করি। তিনি আমাকে পরদিন ভোরে যাইতে বলেন।

সেইমতো আমি গেলে তাহার সাথে অত্যন্ত আন্তরিক আলাপ-আলোচনা হয়। শেখ মুজিব আমাকে একযোগে কাজ করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, আমি কোন পদ বা মর্যাদা চাই না। আমি আপনার পাশে বসিয়া থাকিব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা দিয়া আপনাকে সাহায্য-সহায়তা করিব। অভিজ্ঞতার কোনও বিকল্প নাই।

শেখ বলিলেন : ঠিক আছে, আপনাকে গাড়ী পাঠাইয়া আনাইব ইত্যাদি।

বলিলাম: গাড়ী আমারই আছে, শুধু ফোন করিলেই উপস্থিত হইব।

কিন্তু মুজিব আর কোনদিন আমাকে ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উপযাচক হইয়া দুই-একবার পরামর্শ ও দাবী-দাওয়া পেশ করিয়াছি। কিন্তু তেমন কোন ফল হয় নাই। তিনি তাহার পথে চলিয়াছেন আর আমি আমার পথে। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ এইখানে আর করিতে চাহি না। কেননা তাহা আলাদা প্রসঙ্গ। বিপুল আশাভঙ্গ এবং সীমাহীন রক্তদান ও ত্যাগ ব্যর্থ হইয়া যাইবার সেই কাহিনী আমাদের ইতিহাসকে নতুন উপাদান যোগান দিয়াছে। অবশ্য বাংলাদেশ আছে, আছে এই দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ। জিন্দাবাদ বাংলাদেশ। লং-লিভ ফ্রীডম"।[৯]

"... পাকিস্তানের কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা ফেরার পথে দিল্লীতে থেমেছিলেন, সেখান থেকে আমি তার বিমানসঙ্গী হবার বিরল সুযোগ পাই। পথে তার সাথে নানা ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। প্লেনটা ঢাকার আকাশে পৌঁছে বিমান বন্দরের ওপর খানিকক্ষণ ঘুরছিল। তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অসংখ্য মানুষ দেখে শেখ সাহেব কেঁদে ফেলে বললেন, 'এত মানুষ এসেছে আমাকে দেখতে, এরা আমাকে এত ভালবাসে, কিন্তু আমি এদের খাওয়াব কি করে'? তিনি একথা কেন বলছেন প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, 'পাকিস্তানীরা সব খাদ্য গুদাম পুড়িয়ে দিয়েছে, দেশে তো খাবার নেই'। তাকে আবারও প্রশ্ন করলাম,' তিনি একথা কিভাবে জানলেন'। বললাম, 'আমরা তো বাজারে চাল

৮. আহমদ শরীফ / আহমদ শরীফের ডায়েরি : ভাব-বুদ্বুদ [জাগৃতি প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ । পৃ: ১৯৯-২০০]
৯.আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) / অবরুদ্ধ নয়মাস [নওরোজ কিতাবিস্তান - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ । পৃ: ৮০]

দেখে এসেছি'। শেখ সাহেব বললেন, 'আমাকে যে ঢাকা থেকে লন্ডনে ফোন করে বললো'!

অর্থাৎ দেশের নেতা দেশে ফেরার আগেই তাকে ভয় দেখান হয়েছে যে, সদ্য স্বাধীন দেশ ও জাতি ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছে, কাজেই সাহায্য চাইতে হবে বহির্বিশ্বের কাছে। বস্তুতঃপক্ষে দিল্লী যাবার কয়েকদিন আগেই ঢাকায় দেখে গিয়েছিলাম সরকারীভাবে সাহায্য চাইবার এন্তেজাম হচ্ছে। এই সাহায্য চাইবার নীতি ও ধরন নিয়ে উচ্চতম নেতৃত্বের পর্যায়ে বিভ্রান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ দেশ মুক্ত হবার পরপরই বলেছিলেন যে, যেসব দেশের সরকার আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে তাদের কারো কাছ থেকে কোনো (অর্থনৈতিক) সাহায্য নেয়া হবে না।

ওদিকে পাকিস্তান থেকে লন্ডনে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বললেন যে, এখন থেকে যেসব দেশ আমাদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করবে তাদের সবার কাছ থেকেই সাহায্য নেয়া হবে।

শেখ সাহেবের সাথে আসতে আসতে তার সাথে কথোপকথনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিষয় উঠেছিল। প্রসঙ্গ ছিল অবিলম্বে সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা। এই আলাপের সময় তাকে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী মনি সিংহের একটা প্রস্তাব জানিয়েছিলাম।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কবি জসিম উদ্দীন সাহেবের বাসায় ঘটনাচক্রে শ্রী মনি সিংহের সাথে দেখা হলে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের তৎকালীন যে গণ-পরিষদ তার সদস্যরা সবাই নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৭০ সনের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এবং একজন ছাড়া তারা সবাই ছিলেন আওয়ামীলীগের সদস্য। অথচ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে বহু দল ও সব মানুষ এবং এখন সংবিধান তৈরী হবে নতুন একটা স্বাধীন দেশের জন্য। নতুন দেশের সংবিধান রচনায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে এমন দলগুলোর চিন্তা ও মতামত যাতে বিবেচিত হতে পারে সেজন্য গণ-পরিষদে এই সমস্ত দল থেকে সর্বমোট আট-দশজন প্রতিনিধিকে কো-অপট করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রী মনি সিংহ যখন তার এই ভাবনার কথা বলেছিলেন তখন তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এটা রাজনৈতিক বা আইনগত দিক থেকে অবৈধ হবে না এজন্য যে, গণ-পরিষদ আর জাতীয় সংসদ এক নয়; গণ-পরিষদ সংবিধান রচনা করেই ভেঙ্গে যাবে এবং তখন নতুন সংসদ নির্বাচন করা হবে। তদুপরি যেহেতু এই গণ-পরিষদ যুদ্ধ করে জেতা সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের তাই এর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলাদা।

শেখ সাহেব আমার মুখে এসব কথা শুনে বললেন যে, কথাটা ঠিক, তবে গণ-পরিষদে সদস্য কো-অপ্ট করা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঠিক হবে না। কারণ তাহলে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত ব্যক্তিরা একই সংসদে বসবেন। সেক্ষেত্রে তিনি সংবিধান প্রণয়ন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তাতে অন্যান্য দলের লোকদের রাখবেন তাদের মতামত জানার জন্য এবং তিনি দেখবেন যাতে এদের সুপারিশ সংবিধানে স্থান পায়। কিন্তু এই কাজটি পরে তিনি আর করেননি।

আরো একটি কাজ করতে শেখ সাহেব অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। সেটা ছিল জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক। শেখ সাহেব রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিলেন তখন তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই 'হলিডে' সম্পাদক এনায়েতুলাহ খান তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক কবে হবে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এই কমিটির আহবায়ক কাজেই তিনি যখন

প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই তিনি এর বৈঠক ডাকবেন। তিনি কেনোদিনই এই কমিটির বৈঠক ডাকেননি।

অর্থাৎ গোড়া থেকেই ক্ষমতা একটি দলের হাতে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধ তাতে কোন পরিবর্তন আনেনি। পরবর্তীকালেও একদলীয় সংগঠন বাকশাল গঠন করার সময় বলা হয়েছিল যে, এটা সব দল ও মতের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এর যে সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ বা স্টিয়ারিং কমিটি ছিল তার সব কজনই ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য।

বাকশাল গঠন করে যখন চারটি ছাড়া আর সবগুলো সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হলো তখন বিবিসি'র বাংলা বিভাগের প্রযোজক সিরাজুর রহমানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "আমার দেশে ফ্রি-স্টাইল চলবে না"। তিনি আরও বলেছিলেন যে, খবরের কাগজের সংখ্যা কমিয়ে যে নিউজপ্রিন্ট বাঁচবে তা বিদেশে বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে খাদ্যশস্য কিনে তিনি দেশের গরীব মানুষদের বাঁচাবেন। ততদিনে কিন্তু ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষ (যাতে ৩০ হাজার লোক মারা যাবার কথা সরকারীভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল) পার হয়ে এসেছে বাংলাদেশ।

অর্থাৎ একা একা দেশ চালাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ আর শেখ সাহেব তখন খাবি খাচ্ছেন এবং তাদের হাতে আর কোন যুক্তিতর্ক অবশিষ্ট নেই তাদের যথেচ্ছাচার ব্যাখ্যা করার। একটি গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে গিয়ে এবং দলের ভিতর নেতৃত্বের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বানচাল করার জন্য একজন খুব বড় নেতাকে দেবতা বানিয়ে দশজনের মতামত জানার ও পাঁচজনের বুদ্ধি নেবার প্রয়োজন উপেক্ষা করে চলতে চলতে তখন তারা তাদের অতীত প্রতিশ্রুতির কথা তো ভুলেই গেছেন, সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও হারিয়ে ফেলেছেন"।[১০,১১]

"... এখানে অন্য একটি ঘটনার বিষয় আমার মনে পড়ল। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী যখন শেখ মুজিব লন্ডন-দিল্লী হয়ে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন তখন টারমাক থেকে তিনি যখন তাজউদ্দীন ও মোস্তাকের ঘাড়ে দু'হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন তখন (বর্তমানে মরহুম) অধ্যাপক আফতাব আহমদ (তার জীবিত অবস্থায়) দাবী করেছিলেন যে, মুজিব তাজউদ্দীনকে কিছুটা নীচুস্বরে অনেকটা তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন, 'তাজুদ্দীন শেষ পর্যন্ত তোমরা পাকিস্তান ভেঙ্গে দিলে?' আফতাব সাহেব মন্তব্যটি শুনে নাকি খুবই হতাশ হয়েছিলেন।

মুজিবের এই মন্তব্যটি যদি আংশিকও তার মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় হয়, তাহলে তা আরও প্রমাণ করে যে মুজিব সেই একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তবে তার নাম ভাঙ্গিয়ে কে তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে, সে তো ভিন্ন বিষয়। এ বিষয় তো ঐতিহাসিক সত্য যে, তিনি ১৯৭২ এর জানুয়ারীতে ডি-ফ্যাকটো বাংলাদেশ পেয়েছিলেন। ডি-জুরো বাংলাদেশ নয়"।[১২]

"... ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য তাজউদ্দীন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। মন্ত্রীসভার

১০. আতাউস সামাদ (সাংবাদিক) ['বাংলাদেশ : দুই দশকের রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় / ২৯ জানুয়ারী - ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং]

১১. তথ্যসূত্র : Bangladesh : Past two decades and the current decade / Qazi Khaliquzzaman Ahmad (Editor) [Bangladesh Unnayan Parishad (BUP) - June, 1994 P. 456-458]

১২. মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন / বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গ নিয়ে শেখ হাসিনা মুজিবকে ছোট করছেন, জুলাই ৪, ২০০৯

সবাই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত সব সেক্টর কমান্ডারদের এক সারিতে প্লেন অবতরণের জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল।

সে অভ্যর্থনার মূহুর্তটি ছিল খুব ভাবাবেগপূর্ণ। আমরা সবাই উদগ্রীব হয়েছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখবার জন্য, তার সাথে করমর্দনের জন্য। ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলই ছিল। প্লেনটি থামা মাত্রই দরজা খুলে শেখ মুজিবকে সরাসরি দেখামাত্রই লক্ষাধিক লোক জয়বাংলা ধ্বনি দেয়। ঠিক এই মুহুর্তেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দুই ছাত্রনেতা সম্ভবতঃ খসরু ও মন্টু এবং শেখ মুজিবের দেহরক্ষী সামরিক বেশে এবং কোমরে পিস্তল বহন করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শেখ মুজিবকে আলিঙ্গন করে। সেদিন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল রক্ষা করা হয়নি। দাপট ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দেরই। এ ঘটনা অশোভনীয়, অমর্যাদাকর ছিল। নজরুল ইসলাম সাহেবের মর্যাদাও রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছিল।

যাহোক শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঘটনাটি বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, প্রবাদে বলে, morning shows the day. দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ও স্বল্পশিক্ষিত ছাত্রদের প্রভাব যে অটুট থাকবে তার আভাস পাওয়া গেল। শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের দিনের ঘটনার জের আজো বর্তমান"।[১৩]

"... নয়া দিল্লীর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ একটি সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে মি. ব্যানার্জীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বিমানে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হিসেবে ১৩ ঘন্টা যাপন কালে তাঁকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁকে বলা হয়েছিল 'ভারতের অভিজ্ঞতার' ভিত্তিতে নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা (parliamentary system) গ্রহণ করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে রাজী করাতে হবে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে"।[১৪,১৫]

"... ঢাকা বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু অবতরণ করলে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতির সম্মানে সম্বর্ধনা দেওয়ান। বাসায় পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর যখন তাজউদ্দিন একান্তে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন বঙ্গবন্ধু প্রথমেই কুপিত কণ্ঠে বলেন, "জানি কোন কোন সময় ..... ঢুকাতে দিতে হয়, তাই বলে এভাবে গোটা ঢুকিয়ে দিতে দেওয়া উচিত?" বঙ্গবন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাব বাংলাদেশের ভিতর কি ভাবে আমূল ঢুকে গেছে সেটার ইঙ্গিতেই এ উক্তি করেছিলেন"।[১৬]

দেশের মাটিতে পা রেখেই প্রথমে দেশের সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের পছন্দের লোকদের দিয়ে সংবিধান তৈরি করে তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে দেশে অপরাজনীতির ধারা শুরু হয়। শুরু থেকেই এই বিষয়ে মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হক কথা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে আসছিল।

আজ যারা শাসনতন্ত্র রচনা করতে যাচ্ছেন তাদের হাতে কি এমন কিছু বেরুবে যেখানে মানবাধিকার আর বাক-স্বাধীনতা রয়েছে আর রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি নির্দেশক বাস্তব রূপরেখা?[১৭]

এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উঠেছে এসেছে মুক্তিযোদ্ধা ও ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের লেখাতেও,

"আওয়ামী লীগ শাসনকালের বিশ্বাসঘাতকতার আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর এখান থেকেই শুরু।

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হলে '৭০-এর নির্বাচনের কথায় ফিরে যেতে হয়। '৭০-এ ছিল পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছিল পাকিস্তানের অধীনে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধীনে নয়। সুতরাং '৭২-এ আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংবিধান প্রদান নীতিগত দিক দিয়ে মোটেও বৈধ ছিল না। সমগ্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। অমন একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে আরো উল্লেখ্যযোগ্য যে, '৭০-এর নির্বাচনের আওয়ামী লীগের সপক্ষে যারা ভোট প্রদান করেনি, তারাও দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে শরীক হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিল আওয়ামীলীগ বিরোধী অথবা আওয়ামীলীগ বহির্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় রূপ ধারণ করেছিল।

কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় রূপকে দলীয় রূপ প্রদানের জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়, যার ফলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ বহির্ভূত সকল শক্তি হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের নবতর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করার সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিধ্বংস বাংলাদেশে যখন জাতীয় ঐক্যের সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময়েই আওয়ামী লীগ 'একলা চলো'র নীতি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে জনমত এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে চলতে থাকে। এসব কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ভাটা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের যুদ্ধকালীন দুর্নীতি ও ব্যর্থতা এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জনগণের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন জনগণ থেকে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করার উপসর্গ সৃষ্টি করে।

ভোট ডাকাতির শুরু ১৯৭৩।।

ভোটবিহীন নির্বাচনের সংস্কৃতি প্রথম শুরু হয় আওয়ামী আমলে। আজকের দিনে ভোট ডাকাতির যে মহামারী আওয়ামী লীগে প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে তার উপসর্গ ও বিস্তার শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে। তখনও শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের মানুষ একচ্ছত্র নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। দলটির সন্ত্রাস ও লুটপাটে অতিষ্ট মানুষ মনে করেছিল, নেতা শেখ মুজিব হয়তো কঠোর হস্তে এই অরাজকতা দূর করে দেশকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবেন কিন্তু ঘটনা ঠিক তার উল্টো স্রোতে বইতে থাকল।

ইতিহাস শেখ মুজিবকে যে সুযোগ দিয়েছিল তা তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচনেই দেশের গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। ৭৩-এর নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ দেখে নেয়া যাক:

- কথায়-কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন? অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে? জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশানে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়্যা দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটম্যান অইবার

১৩. কর্নেল (অবঃ) কাজী নূর-উজ্জামান/একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা [অবসর- ফেব্রুয়ারী, ২০০৯। পৃ: ৯]
১৪. India's Security Dilemmas : Pakistan & Bangladesh / Sashanka S. Banerjee
১৫.তথ্যসূত্র : আবদুল মতিন/বিজয় দিবসের পর : বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ [র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স-সেপ্টেম্বর, ২০০৯। পৃ: ৪০]
১৬. মঈনুল আলম (সাংবাদিক) / সাংবাদিকতায় ৫০ বছর [অনুপম প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০১২ । পৃ: ১০৯]
১৭. 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে কারা?' সাপ্তাহিক হক কথা, ১৭ই মার্চ ১৯৭২

সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।

● একই সাথে, নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসার পূর্ববর্তী সময়ের মতো জনসাধারণের মধ্যে আওয়ামীলীগের সেই ব্যাপক প্রভাব ক্ষুন্ন হয়েছে। ভোটারদের প্রায় অর্ধেকই ভোটদানে বিরত ছিলেন এবং ৩ কোটি ৫১ লাখের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৮৫ লাখ ভোটার ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোট ভোটারের শতকরা ৪৩.২ ভাগভোট পেয়েছিল আর ১৯৭৩ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৩৮.৪ ভাগে।

● পাকিস্তান আমলে আমার পিতা ভোলা-৩ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বিরোধীদলীয় উপনেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি সদ্য গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থীরূপে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ভোলা শহরে গেলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা তাঁকে বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ কারণে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। এভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ আসনে নির্বাচিত হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ঢাকায় চারটি এবং ভোলায় একটি আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন।

● ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন দিয়ে আওয়ামীলীগ ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে গেছে। তারা যে এ দেশে গণতন্ত্রের খোলসটুকু পর্যন্ত অতি শীঘ্র ছিড়ে ফেলবে সেটা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার বর্তমান ধারা থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

প্রথমত, নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য সরকারী গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে তারা অবিশ্রান্তভাবে বলে বেড়াচ্ছে যে 'তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে' তারা স্বাধীনতা এনেছে। কাজেই বাংলাদেশ তাদেরই রাজত্ব। অন্য কারো সেখানে বাড়াবাড়ি করার অধিকার নেই।[২২]

● আমি দেখিয়া খুবই আতঙ্কিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম যে নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী নেতৃত্ব অপজিশনের প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন সেটা সাময়িক অবিবেচনা-প্রসূত ভূল ছিলো না। তারা যেন নীতি হিসাবেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্বাচনের ফলে অপজিশন একরূপ শূণ্যের কোঠায় পৌঁছেছিল।[২৩]

● ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় নির্বাচন অবাধও হয় নাই, সুষ্ঠুও হয় নাই। নির্বাচন পরিচালনায় পর্তুগালের সালাজার, স্পেনের ফ্রাঙ্কো আর শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় নাই।[২৪]

দলীয় অন্তঃকলহ।।

সরাসরি রণাঙ্গনের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার পরেও স্বাধীনতা সময়কালের পূর্বেই দলটির মধ্যে যে অন্তঃকলহ চলছিল তা মুজিবনগর সরকারের ভেতরেও প্রবহমান ছিল। বহুধাবিভক্ত এই দলটির প্রধান নেতা স্বাধীন বাংলাদেশে ক্ষমতাগ্রহণ করার পরপরই দেশকে একদলীয় শাসনের দিকে নিয়ে যায়। সেই সময় দেশে আর কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল না থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশে অনুপস্থিত ছিলেন ফলে শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার গঠনকারী অংশ ভারতের সহযোগিতায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত

২২. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-৪১
২৩. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা-৬২৮
২৪. জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, অলি আহাদ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা- ৪৬৩

করতে পারে এমন আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসে। ফলে তিনি স্বাধীনতার পরে মুজিবনগর সরকারের নেতাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রথম ভারতীয় মিশন প্রধান জেএন দিক্ষিত লিখেন,

Mujib's animus against cabinet colleagues who were members of the Mujibnagar Government Manifested itself in his shuffling of portfolios. Sometime around mid-1973 his threat to investigate the secret assets which these cabinet members might have accumulated in India during the liberation war and its immediate aftermath also showed his prejudice against them. I remember Tajuddin Ahmed and Kumarruzzaman confiding in me that such pronouncements and decisions by Mujibur Rahman were a tragic irony which they never thought they would have to face. They even mentioned to me that Mujibur Rahman had issued an internal order that no member of his cabinet should proceed to India even for private visits without his (Mujib's) approval. [25]

এভাবেই শেখ মুজিবুর রহমান তার নিজ দল আওয়ামী লীগের অন্তরেই অবিশ্বাসের বীজ বুনতে থাকেন।

বাংলাদেশের বুক থেকে গণতন্ত্রকেই চিরতরে মুছে ফেলার শুরুয়াত ছিল বাকশাল। বাকশালের এই চিন্তার উৎপত্তি হয় চরম স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব থেকে। আর এই স্বৈরতান্ত্রিক চর্চা শুরু করা হয় খোদ নিজের দলের ভেতর থেকেই। দলে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষার্থে এ ঘৃণিত কাজটি করা হয়। এর ফলেই তাজউদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রতি দিন দিন বাড়তে থাকে তার অবিশ্বাস। তার প্রতি তাজউদ্দীন আহমদের মনোভাবের বিষয়ে জানা যায় তাজ-কন্যা শারমিন আহমদের বই থেকে-

- নেতা যখন অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও সুবিধাবাদীদের কাছে টেনে নেন এবং তাদের প্রশ্রয় দেন তখন তার ভয়াবহ পরিণাম শুধু তার ভাগ্যেই ঘটেনা, পুরো জাতিকেই তার মাশুল দিতে হয়। জাতি পিছিয়ে যায় শত বছর।

- দলের ভাঙ্গন তখন অনেকটাই স্পষ্ট । এরকম অনেক ভাঙন ও স্বৈরাচারী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আওয়ামী লীগের ইতিহাসে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে ৭৫ পরবর্তী এমনকি বর্তমান নেত্রী আওয়ামী লীগের ভার গ্রহণ পর্যন্তও এই ভাঙন সুস্পষ্ট। শেখ মুজিব চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় তাজিউদ্দীনকে এমনই অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁর কাছে কে আসে, কী কথাবার্তা হয়; এসব খবর তাঁকে জানাতে তিনি তৎকালীন অর্থসচীব কফিলউদ্দিন মাহমুদকে অনুরোধ করেছিলেন।[২৭]

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের জামাতা ওয়াজেদ মিয়ার বই থেকে জানা যায়,

খন্দকার মোশতাক বলেন, "আগামীকাল তোমার শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) সংবিধানের যে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন, তা করা হলে সেটা শুধু একটি মারাত্মক ভুলই হবে না, এর ফলে দেশে এবং বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিও অপূরনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৮]

সুতরাং দলের এই বিভাজনের মাঝে শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ দলে ও রাষ্ট্রীয় কার্যে নিজ

24. JN Dixit 164

কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বাকশালের জন্ম দেন তিনি। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বই তাঁকে বাকশালের দিকে ধাবিত করে। আর সেই রাজনীতিহীন এক স্বৈরাচারী প্রয়াসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আওয়ামী লীগের সর্বগ্রাসী ফ্যাসিবাদী রাজনীতি। বাকশালের গোটা দেহকে বুঝতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী, মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সকল ঘটনাক্রমকে নিবিড়ভাবে জানতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে। ইতিহাসকে দেখতে হবে সত্যের চশমায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী যে শাসনের ইতিহাসকে গৌরবদীপ্ততার সাথে আজকাল প্রচারিত হতে দেখা যায়, বাস্তবতা ছিল ঠিক তার উল্টো। মূলত দুর্নীতি, লুটতরাজ, গুম-খুন-ধর্ষণ এর মত অপরাধ আর দুর্যোগে ছয়লাব হয়ে পড়েছিল এই সমাজ। তা ছাড়া বাজারে দলকানা, অন্যায্য বন্টন আর গুদামে খাদ্য থাকা সত্ত্বেও অসৎ ও অদক্ষ ব্যপস্থাপনার কারণে লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিল। দেশ কবলিত হয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও বন্যায়। বাংলাদেশের সে সময়ের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন লিখেছেন, খাদ্যের অভাবই মহামারীর কারণ নয়। দুর্ভিক্ষ ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেও দুর্ভিক্ষ হতে পারে। মাসকারেনহাসের বই থেকে জানা যায়, এই অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ কীভাবে ফুঁসে উঠেছিল। খাদ্য-ঘাটতি নিয়ে তাঁর বইটিতে আ স ম রবের একটি জনসভার কথা উল্লেখ আছে। তার বিবরণ অনুযায়ী:

Abdur Rab, the student leader and former Mukti Bahini freedom fighter who was once one of Mujib's staunchest supporters, was telling the crowd: 'No one would be allowed to die of starvation after independence. Now people are dying for want of food'. [29]

এরকম এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও নৈরাজ্যকালে দেশ নিমজ্জিত ছিল চরম স্বজনপ্রীতিতে। অনেকের মতে গণতন্ত্রহীনতা ও ভিন্নমত অসহিষ্ণুতায় তৎকালীন শাসনটি ছিল পাকিস্তানি শোষণ থেকেও বর্বর। এ ব্যাপারে ওরিয়ানা ফালাচ্চির ভাষ্য ছিল:

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গনতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তাঁর সাথে একমত না হয়, তিনি তাঁকে "রাজাকার" বলেন। বিরোধিতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষণকারীকে কারাগারে প্রেরণ। তাঁর চরিত্র একজন একনায়কের, অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গনগনে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েছে। বাঙ্গালী রমণীদের প্রতি সন্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সম্পর্কে কথা না বলাই উত্তম, তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না..।[৩০]

উল্লেখ্য পেশাদারী দায়িত্ব পালনে ফালাচ্চি স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিতে আসেন এবং সে সময় তার বিড়ম্বনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়েই এসকল কথা বলেছিলেন। তাছাড়া বাহাত্তরে ১৭ই সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় আ স ম আব্দুর রব বলেন,

The Awami Leaguers are more corrupt and much worse than the Pakistanis ever were.' Rab declared.[31]

২৬. তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ২০১৪, ১৭৫
২৭. তাজউদ্দীন আহমদ: আলোকের অনন্তধারা; প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা: সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা -১৯০
২৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এ. ওয়াজেদ মিয়া, পৃষ্ঠা ২১৪
২৯. Legacy of Blood, Anthony Mascarenhas, Page-19
৩০. ওরিয়ানা ফালাচ্চি সাক্ষাৎকার গ্রন্থ, ইন্টারভিউ ইউথ হিস্ট্রি, অনুবাদ: আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, পৃষ্ঠা-১১
31. Legacy of Blood, Anthony Mascarenhas, Page-19

সেই সময় চারদিকে চরম বিপর্যয় ও শোষণ বঞ্চনা এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। এতকিছুর পরেও দেশের মানুষ টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। মূলত নতুন দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই ক্রান্তিকাল কাটিয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব হবে এমনটাই মনে করছিল সাধারণ জনগণ। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাহায্যের সিংহভাগই আওয়ামী দলীয় লোকজন লুট করে নিয়ে যায়। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলার ভয়ানক অবনতির কারণে রাষ্ট্রে তৈরি হয়েছিল চরম নৈরাজ্য। পত্রিকার শিরোনামে তখন বিরাজমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপশাসন ও দুর্নীতির চিত্র।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন কিছু পত্রিকার শিরোনাম দেখে নেয়া যাক:

- শহরে আর একটি ডাকাতি (ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)
- ৯ মাসে রংপুরে ৩০২ টি খুন: ২২৫ টি ডাকাতি (ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২)
- জয়দেবপুরে সশস্ত্র ব্যংক ডাকাতি: সাড়ে আটাত্তর হাজার টাকা ছিনতাই (ইত্তেফাক, ৫ এপ্রিল ১৯৭৩)
- থানা, খাদ্যগুদাম, ব্যাংক, ডাকঘর ও অয়্যারলেস কেন্দ্র লুট (ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর ১৯৭৩)
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর: ১০২৮০ টি ডাকাতি হয়েছে, বাজার লুট হয়েছে ১৩টি, থানা থেকে প্রায় ৪শ আগ্নেয়াস্ত্র লুট, দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় ১৮০৯ জন নিহত (গণকণ্ঠ, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)
- সংসদে স্বরাষ্টমন্ত্রীর তথ্য: এ পর্যন্ত ৯৫৬০টি নরহত্যা: ১২২৪টি ডাকাতি। ২৭১ টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে (গণকণ্ঠ, ২৯ জুন ১৯৭৪)

১৯৭৩-৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাকশাল ও আওয়ামী দুঃশাসনের আরও কিছু উলেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিম্নে দেয়া হ'ল:

- শীগগির গনআন্দোলন শুরু করবো: ভান্যাপ নেতা কাজী জাফরের ঘোষণা। (উল্লেখ্য তিনি সরকারের অগনতান্ত্রিক কার্যকলাপ এবং নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে এ আন্দোলন শুরু করার কথা বলেন)। (দৈনিক আজাদ, ১৩/০৩/১৯৭৩, প্রথম পৃষ্ঠা)
- গনশত্রুদের উৎখাতে, সেনাবাহিনী রক্ষীবাহিনী বিডিআর প্রস্তুত- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (আব্দুল মালেক উকিল) (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩/০৩.১৯৭৩)
- ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে- বিধান কৃষ্ণ সেন। (গণকণ্ঠ, ১৪/০৫/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- সংবাদপত্র জাতির কণ্ঠস্বর, তার স্তব্ধতা নির্জীবতার শামিল- প্রেসক্লাবের জনসভায় চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক জনাব আবুল ফজল (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৯/০৭/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- দেশ স্বাধীন হইলেও সাংবাদিকরা পেশাগতভাবে স্বাধীন নন। - নির্মল সেন। (দৈনিক ইত্তফোক, ১১/০৮/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে আই.জি.র অভিমত: রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও পরিস্থিতির অবনতির জন্য কিছুটা দায়ী । আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বদ্ধপরিকর। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪/০৮/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)

- ভাসানী ন্যাপের অভিযোগ: ৪টি কেন্দ্রে মনোয়ন পেশ করতে দেয়া হয়নি। (দৈনিক বাংলা, ০৮/০২/১৯৭৩ ১ম পৃষ্ঠা)
- ভাসানী ন্যাপের পার্লামেন্ট বোর্ডের সভা : নির্বাচনী প্রচারের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশে সৃষ্টির আহ্বান। (দৈনিক বাংলা ১৩/০২/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- রক্ষবাহিনীরা সমাপনী কুচকাওয়াজে দৃষ্কৃতিকারীদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ নজরুল, কঠোর আঘাত হানা হইবে। (দৈনিক ইত্তেফাক ২৪/০৭/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- দুর্বৃত্তেরা 'ফ্রি স্টাইল' (দৈনিক ইত্তেফাক ০১/০৮/১৯৭৩, ১ম পৃষ্ঠা)
- সাংবাদিকদেরা পেশাগত দাযিত্ব পালন প্রসঙ্গে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বক্তব্য : দেশের সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলি নির্ভীক ও বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশন বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে উক্ত সভা। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৭/০১/১৯৭৪, ১ম পৃষ্ঠা)
- ১৪৪ ধারা পুনর্বহালের আদেশ অবৈধ অচল এখতিয়ারবহির্ভূত ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। (দৈনিক ইত্তেফাক ২৪/০৮/১৯৭৪, ১ম পৃষ্ঠা)
- মওলানা ভাসানীর বিবৃতি: আজ- আড়াই মাস হইতে চলিল আমি সরকারের কড়া প্রহরী বেষ্টিত নজরবন্দী। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫/০৯/১৯৭৪, ১ম পৃষ্ঠা)
- মওলানা ভাসানী ঈদের নামায আদায় করিতে পারেন নাই- শারীরিক আসুস্থতা ও চলাফেরার উপর সরকারী বিধি- নিষেধ জারি থাকার দরুন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২০/০৯/১৯৭৪,২য় পৃষ্ঠা)
- খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব মোতাবেক অনাহার ও রোগে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গিয়াছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩/১১/১৯৭৪, ১ম পৃষ্ঠা)
- রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ : (প্রসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম : সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম হইয়াছে। গতকাল (শনিবার) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের সর্বময় ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর হাতে ন্যস্ত থাকিবে অতঃপর দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিবে জাতীয় সংসদের কোন সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের সদস্য তালিকাভুক্ত না হইলে তাহার সংসদ সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে। দেশের নির্বাহী কতৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংবিধান অনুযায়ী তিনি তাহার প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে পালন করিবেন। রাষ্ট্রপরিচালনার রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাষ্ট্রপরিত একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিবেন। আজ নয়ামন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রহণ করিবেন। চতুর্থ সংবিধান সংশোধনী বিল ২৯৪-০ ভোটে গৃহীত হয়। এই বিলের বিরোধিতা করিয়া ৩জন বিরোধী ও ১জন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। জনাব আতাউ রহমান খান পূর্বাহ্নে সংসদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক,২৬/০১/১৯৭৫, ১ম পৃষ্ঠা)
- একটি মাত্র জাতীয় দল কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ, পার্টির চেয়ারম্যান পদে বঙ্গবন্ধু: অন্যান্য দলের অবলুপ্তি : ১৪টি রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটল তা হ'ল :-১। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২। ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি (মোজাফ্ফর) ৩। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি। ৪। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ৫। জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক দল ৬। ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ৭। জাতীয় গনমুক্তি ইউনিয়ন (বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি ও বামপন্থী কর্মিগন) ৮। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ৯। বাংলা জাতীয় লীগ ১০। বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১১। জাতীয় গণতন্ত্রী দল ১২। বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস ১৩। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৪। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। (দৈনিক ইত্তেফাক ২৫/০২/১৯৭৫, ১ম পৃষ্ঠা)

- রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনীতি চর্চাকে বাধাগ্রস্থ করা হইতেছে-অধ্যাপক মরিস জোন.স (দৈনিক ইত্তেফাক, ২০/০৩/১৯৭৪, ১ম পৃষ্ঠা)
- সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ (দৈনিক ইত্তেফাক ২৭/০৬/১৯৭৫, ১ম পৃষ্ঠা)
- বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শণ করিবেন। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৫/০৮/১৯৭৫, ১ম পৃষ্ঠা)।

সে সময়কার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় সরকার। অতঃপর বে আইনিভাবে সংসদে পাস করা হয় জরুরি অবস্থা। এই বিষয়ে মহিউদ্দিন আহমদের বই থেকে জানা যায়: ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহ সংবিধানের ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদের (১) দফায় দেওয়া ক্ষমতাবলে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে বলা হয়ঃ 'এমন ভয়াবহ জরুরি অবস্থা ঘোষণা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন।[৩২]

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গ্রেফতার।।

সে সময় এই ব্যর্থ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে চান ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদ। নাগরিক সংগঠন মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মওদুদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার বিষয়টি আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নেন। রাতে হলিডের সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান এবং ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তার বাসায় আসেন। তাদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। পরদিন সকালে মওদুদ গ্রেফতার হন।[৩৩]

সদ্য স্বাধীন একটা দেশে এহেন ন্যাক্কারজনক পরোয়ানা দেশের স্বাধীনতাকে শুধু ভূলুণ্ঠিতই করে না। তা গোটা আইনি ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে। উক্ত গ্রেফতার এবং এ বিষয়ক কিছু স্মৃতি বর্ণনায় মওদুদ আহমদ বলেন: স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি জব্বার সাহেব গাড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রথমে আমার চেম্বারে। সমস্ত ফাইলপত্র ঘাঁটলেন। যত রাজনৈতিক কর্মীর মামলা করেছি তাদের হদিস নিলেন। ... আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়েছিল, গাড়ি করে আমাকে সব সময় অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কেনোদিন চেম্বারে ঢোকার সাহস করেনি। শেখ মুজিবকে ডিফেন্ড করার জন্য তো তখন আমাকে আটক করেনি! দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব নিয়ম কানুনের পরিবর্তন হয়েছে।'[৩৪]

গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত মওদুদু আহমদ জানতেন না, কার নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মওদুদ আহমদের ভাষ্য "ওরা যখন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন, শেখ সাহেব জানাে-লন আমাকে কারাবন্দি করার নির্দেশ তিনি নিজেই দিয়েছেন। টেলিফোনে যখন তারা এই খবরটা দিলেন তখন আর দেরি করিনি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে পড়লাম জেলখানায় যাওয়ার জন্য"।[৩৫]

৩২. বেলা অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫, মহিউদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১৮৮
৩৩. বেলা অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫, মহিউদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১৮৮
৩৪. বেলা অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫, মহিউদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১৯০
৩৫. বেলা অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫, মহিউদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১৮৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মওদুদ আহমেদ জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তাঁর আইনজীবী ছিলেন। তখন পাকিস্তানী পুলিশ তাঁর চেম্বারে যেতে সাহস পায়নি এবং তাঁকে গ্রেফতার করেনি। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, স্বাধীন দেশে সেই শেখ মুজিবুর রহমানই মওদুদ আহমেদকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন, পুলিশ মওদুদ সাহেবের অফিস তল্লাশি করল এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হল। কি বিচিত্র আমাদের এই রাজনীতি! কি বিচিত্র আমাদের এই দেশ!

এই অপশাসন ও শোষণের ফলে জনগণের ক্ষোভ দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সাধারণ জনগণ বিশেষত শ্রমিক শ্রেণি রাজপথে নেমে এসেছিল। আর সাধারণ জনগণের এই বিক্ষোভকে স্বৈরাচারী কায়দায় সুনিপুণভাবে রুখে দিচ্ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার। এমন একটি রক্তাক্ত ঘটনার কথা জানা যায় বরেণ্য বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর-এর লেখা থেকে:

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বাড়বকুণ্ডে অবস্থিত আর আর টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের ওপর ব্যপক হামলার খবর এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি হিসেব মতে সেখানে নিহতের সংখ্যা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে ২২ জনে। বেসরকারি শ্রমিকও অন্যান্য সূত্রের খবরে বলা হচ্ছে যে, সেখানে নিহতের সংখ্যা শতাধিক। সব মিলিয়ে সেখানে হতাহতের সংখ্যা বিরাট।[৩৬]

রাশিয়ান লেখক ভ্লাদিমির পুচকভ মুজিবের শাসনামলের রক্তাক্ত এসব ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন,

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে সরকার-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার সন্দেহে ২০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। কিন্তু এর ফলে সার্বিকভাবে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংকটের অবসান ঘটেনি।[৩৭]

সেই সময় সাধারণ ক্ষমার আওতায় অনেক দাগী আসামিকেও মুক্তি দেয়া হয়। যারা স্বাধীনতার সময় এবং পরেও বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ছিল তারাও দুর্নীতিপরায়ন শাসনের ফাঁক গলে ছাড়া পেয়ে যায় বলে জানা যায়।

সেই সময়ের কিছুটা সমাজ-চিত্র পাওয়া যায় রাজনীতিবিদ আবদুল হকের লেখাতেও-

সব কিছুর বাজারে আগুন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কখনো এত বাড়েনি, দুর্নীতি কখনো এত দেখা যায়নি। বেশির ভাগই দায়ী ব্যবসায়ীরা, দায়ী সরকারি অনেকেই, দায়ী বাংলাদেশ বিরোধীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, আওয়ামী লীগ আর সরকারী প্রশাসনই এজন্য দায়ী, আরো দায়ী মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। এত বড় অভিযোগ বিশ্বাস করা শক্ত, এমনিতেই দেশে ভোগ্য পণ্যের অভাব, তার ওপর এদেশি ও ভারতীয় চোরাকারবারীর হাত মিলিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো যথেষ্ট সৎ কর্মচারি ও অভিজ্ঞতার অভাব; তার ওপরে এদেশি লোকেরাই এদেশের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য, এমনকি ভারতের দেওয়া পণ্য মাথায় করে ভারতে পৌঁছে দিয়ে আসছে। সরকার পুরোপুরি দায়ী নয়, কিছু দায়ী পণ্যের অভাব, কিছু অভিজ্ঞতার অভাব, কিছু সৎ কর্মচারির অভাব, কিছু দায়ী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, কিছু সাধারণ মানুষ পুরোপুরিভাবে সরকারকে আওয়ামী লীগকে, শেখ সাহেবকে, এমনকি স্বাধীনতাকে দায়ী করছে। বলছে 'স্বাধীনতাকে পেয়ে কি লাভ হলো, ভোট দিলে আবার গোলমাল হবে'।[৩৮]

৩৬. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা- ৫১

৩৭. বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা: ১৯৭১-১৯৮৫, ভলাদিমির পুচকভ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৭৩

৩৮. রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩, আবদুল হক, ১৯৯৬, পৃ. ২৯২

এই অপশাসন কায়েম করেও ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে বাকশালের মত অন্যায্য ও স্বৈরাচারমূলক একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করলেন তদানীন্তন সরকার প্রধান।

৭৪ এর দুর্ভিক্ষ।।

সীমাহীন অরাজকতার ফলে দেশে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সে সময়কার দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যবন্টন অব্যবস্থাপনার বর্ণনা পাওয়া যায় মওদুদ আহমদের লেখায়-

১৯৭৩-৭৪ সালে মূল লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২০ লাখ টন ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ১৮ লাখ টনের স্থলে খাদ্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১৮ লাখ ৩০ হাজার টন। লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করায় সে বছর খাদ্য আমদানির পরিমাণও বাড়িয়ে ২২ লাখ টনে স্থির করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যোৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার টন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত হয় ১ কোটি ১২ লক্ষ ত্রিশ হাজার টন। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যের মাথাপিছু, বার্ষিক প্রাপ্যতা ছিল ৩৩৯ পাউন্ড বা স্মরণকালের মধ্যে নিম্নতম।[৩৯]

অনেক আওয়ামী লেখক-বুদ্ধিজীবী এটাকে প্রাকৃতিক কারণ হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় লেখক আহমদ ছফা গণকণ্ঠে একটি কলাম লিখেছিলেন। সেই লেখাতেই আমরা প্রকৃত সত্য দেখতে পাই-

এই মন্বন্তরের আসল কারণ বন্যা নয়, সাইক্লোন নয়, খরা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা আকস্মিক নৈসর্গিক বিপদাপদ এর কোনটাই নয়। এই মন্বন্তর শেখ মুজিবের তস্কর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, আওয়ামী লীগারদের একটানা তিন বছরের নির্মম লুণ্ঠন, হৃদয়হীন চৌর্যবৃত্তি, তুলনাবিহীন সম্পদ পাচার, অপচয়, ধ্বংস এবং অদূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতির সমূহফলশ্রুতি। বন্যা না-হলেও এই মন্বন্তর ঠেকাবার কোন যাদুমন্ত্র শেখ মুজিব সরকারের ছিল না।

গণকণ্ঠ

বন্যার দরুন শস্যহানি, ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ আমদানী, বণ্টনে অব্যবস্থা, মজুতদারী ও চোরাচালানের পরিণতি

খাদ্য সংকট তীব্রতর হচ্ছে

এই মন্বন্তর বন্যার কারণে হয়েছে, কি আওয়ামী লীগারদের কারণে হয়েছে, সে কথা আজ ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখবার মত মানসিক স্থৈর্য খুব কম মানুষেরেই আছে। সমাজের স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরও বুদ্ধি-বিবেচনা আজ গুলিয়ে একাকার হয়ে গেছে। চূড়ান্ত হতাশ, অসহায় দৃষ্টিতে তাঁরাও নিরব দর্শকের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। বাংলাদেশের শহরগুলোতে স্রোতের জলের মত কঙ্কালসার নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের ঝাঁক এসে ভিড় করছে। কানায় কানায়

৩৯. বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ (অনুবাদক: জগলুল আলম), ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৭২

ভরিয়ে তুলেছে সমগ্র শহর। নগরীর বাতাসে মানুষ পঁচা লাশের পুঁতিগন্ধ, নগরীরর রাজপথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লাশ, ফাঁকা জায়গাগুলোতে কিলবিল করছে ভূখা-নাঙ্গা মুমূর্ষু মানুষের জটলা। এদের অল্প ক'দিন আগেও ঘর ছিল, ঘরের মায়া ছিল, সংসার ছিল, সংসারের বাঁধন ছিল, বুকে স্বপ্ন ছিল, অন্তরে মমতা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে গ্রাম-বাংলার ছোট ছোট কুটিরে স্ত্রী-পুত্র পরিজন পরিবেষ্টিত পরিবারগুলোতে প্রাণ-প্রবাহের যে রস, যে মাধুর্য উছলে ওঠত- সব পেছনে ফেলে এর শহরের রূঢ় রৌত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ তাদের ঘর নেই ঘরের মায়া উধাও। সংসার নেই, সঙ্গম নেই, বুকের স্বপ্ন কচি মুকুলের মত কবে ঝরে গেছে। জীবন ধারণের নিষ্ঠুর গ্লানি অবনতমস্তকে বয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাত চাই। ভাত নেই তো ফ্যান দাও। ফ্যান যদিও-বা না দেবে অন্য কিছু দাও।

আর আপনার দলের লোকেরা সেই মৃত, অর্ধমৃত মানুষের হাড়-গোড়, চর্বি-মাংস সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুদের কাছে বেঁচে দিয়ে অর্জিত সম্পদের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা তৈরি করছে, তখনো আপনি বঙ্গবন্ধু থেকে যান। আপনি বাংলাদেশের মানুষের যদি বন্ধু হন, তাহলে তাদের শত্রু বলব কাকে? এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা আর আপনার আওয়ামী লীগ দু'য়ের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর, গ্রাম-বাংলাকে নগ্ন করে গতরের মাংস কে বেশি খুবলে নিয়েছে। জল-বন্যার ডাকাত আর আওয়ামী লীগের ডাকাত উভয়ের মধ্যে কে বেশি হিংস্র জিজ্ঞেস করুন, জবাব পাবেন; জিজ্ঞেস করুন, একফোঁটা দুধের অভাবে মরণের মুখে ঢলে পড়া শিশুর কাছে; জিজ্ঞেস করুন, গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত আট আনায় ইজ্জত বিকানো সরলাকিষাণ বউয়ের কাছে; জিজ্ঞেস করুন, অচল কারখানাগুলোর লোহালক্কড়ের কাছে; জিজ্ঞেস করুন, আওয়ামী লীগের মোটা চাঁদা দেয়া চোরাচালানীদের কাছে; জিজ্ঞেস করুন, আঙুগুল ফুলে কলাগাছ হওয়া আওয়ামী লীগের কর্মীদের, আপনার মামা এবং ভাগ্নেদের কাছে; জিজ্ঞেস করুন, ছেলে-সন্তান, স্ত্রী-পুত্রের কাছে; অকপটে জিজ্ঞেস করুন, জিজ্ঞেস করুন অর্থনীতি শাস্ত্রের কাছে। স্পষ্ট সহজ জবাব পাবেন- এই মন্বন্তর, এই দুর্ভিক্ষ, এই মাৎসান্যায় আপনার আওয়ামী লীগের তিন বছরের শাসনের অনুপম কীর্তিস্তম্ভ।[৪০]

জাসদ ও গণবাহিনী।।

সে সময় মাঠে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র শত্রু ছিল আওয়ামী লীগ ভেঙে জন্ম নেয়া জাসদ ও তাদের গণবাহিনী। আর নিজেরদের ক্ষমতা রক্ষায় শেখ মুজিব

৪০. আওয়ামী লীগের কীর্তিস্তম্ভ এই মন্বন্তর, সেইসব লেখা, আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা ৬৭- ৬৮

প্রতিষ্ঠা করেন রক্ষীবাহিনী। যা তৎকালীন সময়ে একটি সরকারি পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়। রাজনৈতিক গুম-খুন ছিল রক্ষী বাহিনীর একটি প্রতিষ্ঠিত কর্তব্য। সরকার-বিরোধীদের দমনের সবচেয়ে বড় সংস্থা ছিল এই রক্ষী বাহিনী। তাদের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায় আহমেদ মূসার লেখায়,

আমার সামনে ছেলেকে গুলী করে হত্যা করলো। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, মাথা কেটে দে, ফুটবল খেলব। আমি কি তা পারি? আমি যে বাপ! কিন্তু অত্যাচার কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়? সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি।[৪১]

এ পটভূমিকায় আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করতে উঠে পড়ে লাগে জাসদ। প্রতিষ্ঠা করে গণবাহিনী।

জাসদসহ ভাসানী ন্যাপ এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করে। মাওলানা ভাসানী আরও একবার স্বশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেন। অন্যদিকে গণবাহিনীর আক্রমণ ও হামলায় দুর্নীতিগ্রস্থ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে থাকে। ঠিক সে সময় বাকশালের মত কুখ্যাত একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করা হ'ল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য গদিচ্যুত হওয়ার ভয়ে। আর সে সময় আওয়ামী লীগের কাঠামোগত অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। দলটি ছিল পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন। সে কারণে আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশে জন্ম নেয় অভূতপূর্ব এক একনায়কতন্ত্র। মূলত চিরকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পূর্ণ চর্চা চালিয়ে দেশের একচ্ছত্র নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াসেই বাকশালের সৃষ্টি করা হয়। বাকশাল এমন একটি সরকার কাঠামো ছিল যার মাধ্যমে অঘোষিতভাবে গোটা দেশটাই হয়ে উঠলো তার নিজস্ব রাজ্য। বাকশালের ঘোষণা দেওয়া হয় সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। যেখানে রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকশালের এই ঘোষণার মাধ্যমে গণতন্ত্রের গলা চিপে ধরা হয়েছে।

৪র্থ সংশোধনী অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচেনের কথা বলা হলেও কোনো নির্বাচন অর্থাৎ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট ছাড়াই শেখ মজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি বনে যান (Deemed to have been elected president) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেয়া হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে চুড়ান্তভাবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঠুকে দেয়া হয় গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক।

বাকশাল প্রতিষ্ঠা।।

১৯৭৩ সনে ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মধ্যমে ক্ষমতা দখল করে দলটি বুঝে গিয়েছিল, জনগণের মন থেকে তাদের উপর আস্থা উঠে গেছে। ফলে একদলীয় শাসনকে কায়েম করা ছাড়া ক্ষমতায় থাকার আর কোন সুযোগ নাই। এবং তারা এবার অগ্রসর হয় সেই ভয়ংকর বাকশালের দিকে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। সমস্ত 'আস্থা' রুপ নেয় হতাশায়। লেখক মাসুদল হক এ বিষয়ে তার বইয়ে লিখেছেন:

একই সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল দাবি তোলে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যেসব দল তাদেরকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। শেখ মুজিব তাদের দাবিও অগ্রাহ্য করলেন। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে শেখ মুজিব আজীবন গণতন্ত্রের

৪১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমেদ মুসা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৬৭

জন্য সংগ্রাম করেছেন, জেল জুলুম নির্যাতন সয়েছেন, তিনি এই গণতান্ত্রিক দাবি অগ্রাহ্য করলেন কেন? এ কেমন ধারার মানসিকতা?

আদতে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার কথা তার মুখে উচ্চারিত হলেও এক আশ্চর্য রকমের আধিপত্যকামী মানসিকতা আগাগোড়াই তার ভেতর ক্রিয়াশীল ছিল। এধরনের মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য তো করতে পারেনই না, অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন।" [৪২]

ইত্তেফাক

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

যারা শেখ মুজিবের অনেক ঘনিষ্ট ছিল তাদের মধ্যেও তৈরি হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এমনকি তার পরিবারে সদস্যরাও তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যকে নিয়ে বিপাকে ছিলেন। বিশেষ করে, শেখ ফজলুল হক মনি ও শেখ কামালের কিছু কিছু কাজের ফলে তাঁরা শুধু নিজেরাই বিতর্কিত হননি, এর দায় নিতে হয়েছে শেখ মুজিবকে। পিতা শেখ মুজিবের প্রতি পুত্র কামালের ছিল প্রচণ্ড আবেগ ও ভালোবাসা। এ জন্য শেখ কামাল অতি উৎসাহে অনেক কিছুই বলতেন বা করতেন, যার জন্য মেখ মুজিবকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হতো।[৪৩]

ইত্তেফাক

রাষ্ট্রপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম

ইহা আমার দ্বিতীয় বিপ্লব

কিন্তু এই বিব্রত হওয়ার পালা শেষ হয়ে যায় বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে। বহুত্ববাদের কবর দিয়ে গণতন্ত্রকে কবর দেয়া হয়। সরাসরি "একদেশ, একদল, এক নেতা" কায়েম হয়। রীতিমত ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশে শুরু হয় তথাকথিত সাংবিধানিক ফ্যাসিবাদ। এ বিষয়ে মরহুম আনোয়ারুল আলম লিখেছেন: কণ্ঠভোটে (বাকশাল ঘোষণা ১৯৭৫, ২৫ জানুয়ারী) সংশোধনী

৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ১১২-১১৩
৪৩. জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি, মহিউদ্দিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৫৩

টি পাস করার সময় সারোয়ার বলে উঠলো, ' বঙ্গবন্ধু আজ গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরলেন।' কারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ে, এ সময় কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখে নতুন শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে তাঁর অসাধারণ অবদানকে স্মরণ করে তাঁকে অবসরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৪৪]

অনেকে নিজেরা যোগ দিলেও অনেককে বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। সারকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ। সাংবাদিক এবিএম মূসা লিখেছেন:
বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচি সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ করেছিল আমলাদের। জেলায় তাঁদের ওপর খবরদারি করার জন্য রাজনৈতিক গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। কালক্রমে তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে উচ্চপদে যাঁদের বসিয়েছিলেন, তাঁদের সরিয়ে দিয়ে আমলাতন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪৫]

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত একটি দেশের জনগণের উপর এমন ভয়াবহ একদলীয় বাকশালী শাসন চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব তাদের মনে কীভাবে উদয় হ'ল তা ইতিহাস অনুসন্ধানী জনগণের মনে একটি বিরাট প্রশ্ন হিসেবে থেকে গিয়েছে। আমরা বিভিন্ন রকম তথ্য দেখতে পাই। তবে বাকশাল গঠনে সিপিবি খুব উৎসাহিত হয়েছিল-
বাকশাল গঠিত হবার পরে সাংগঠনিকভাবে নগণ্য প্রনিধিত্ব সত্বেও তারা বাকশালে কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে অতিমাত্রায় আন্তরিক ও উৎসাহিত ছিল। এমনকি বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য তারা নিজেদের দলকে বিলুপ্ত করে দেয়।[৪৬]

স্বাধীনতার সময় থেকে সোভিয়েতপন্থী আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট মনোভাব থেকে যারা শেখ মুজিবকে সামনে রেখে মুজিব বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, মুজিববাদ ইত্যাদিতে মেতেছিল তারা এবং অন্যদিকে, আমেরিকা-পাকিস্তানবাদি মোস্তাক ধারা তারা যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় থাকতেই মরিয়া ছিল সবসময়। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো ভেবেছিলেন, বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে সব দলকে বিলুপ্ত করে আওয়ামী শাসনকে দেশের মাটিতে চিরস্থায়ী করা যাবে। আর যারা বিরোধিতা করবে বা বাকশালে আসবে না তাদের কৌশলে দল থেকে বের করা হবে বা বেরিয়ে যেতে বাধ্য করার কৌশল নেয়া হবে। ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (এলএফও) ঘোষণা করে যেভাবে গোটা সংসদ ও গণতন্ত্রকে এক ব্যক্তির হাতে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে ৪র্থ সংশোধনী আনয়ন ও বাকশাল কায়েম করে আওয়ামী লীগ ঠিক পাকিস্তানী শাসকদের পথেই নিজেদের পরিচালিত করেছিল।[৪৭]

চারটি পত্রিকা বাদে দেশের সবক'টি সংবাপত্র বিলুপ্ত করা হয়।।

বাকশালের দর্শন আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম বাধা ছিল মুক্ত গণমাধ্যম। তাই ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন এক সরকারি আদেশবলে দেশের সবক'টি সংবাপত্র বিলুপ্ত করে দিয়ে বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়।অবশ্য বাকশালের প্রচারণার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ইত্তেফাক,

৪৪. রক্ষীবাহিনীর সত্যমিথ্যা, আনোয়ার উল আলম, পৃষ্ঠা-১৩৩
৪৫. মুজিব ভাই, প্রথমা প্রকাশনী, এবিএম মুসা, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৯৫
৪৬. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ, হরপ্পা প্রকাশনী. লন্ডন-২০২০, পিনাকী ভট্টাচার্য, পৃষ্টা-৩৯২
৪৭. বাংলাদেশ এ্যা স্ট্রাগল ফর নেশনহুড, পৃ-৩২

দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার এবং বাংলাদেশ টাইমস এই চারটি পত্রিকা চালু রাখা হয়।

ইত্তেফাক

লাদেশে চারিটি দৈনিক: ইত্তেফাক দৈনিক বাংলা অবজার্ভার টাইমস্

১৯৭৫ সালের ১৭ জুন প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক

মুক্তচিন্তা বা ভিন্নমতের লেখকদের নানান ধরনের হয়রানীর কবলে পড়তে হলো। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বাকশালের দল পরিচালনা এবং দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাই কেউ তার সমালোচনা বা ভুল ধরিয়ে দেবার সুযোগ পায়নি। যারা কাছের মানুষ ছিল তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে বিভ্রান্ত করতে থাকল। ব্যবহার করতে থাকল। সাধারণ জনগণ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিলেন বাকশাল প্রেসিডেন্ট। শেখ মুজিবুর রহমানও পারেনি গণমত উপেক্ষা করে তার বাকশালকে বাঁচাতে। তার মৃত্যুর পর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে আবার বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। খুলে দেওয়া হয় সকল গণমাধ্যম। পতন হয় বাকশালের।

ইয়াহিয়ার এলএফও এবং শেখ মুজিবের ৪র্থ সংশোধনী।।

৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যেখানে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে আইনিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, ঠিক একইভাবে এলএফও বা লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার নামে আইনের বলে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে ১৯৭০ এর নির্বাচনের ঘোষণা আসে। এবং ১২০ দিনের মাথায় নতুন সংবিধান ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয় সংসদকে। তবে সকল ক্ষমতার উৎস সেখানে ইয়াহিয়াকেই রাখা হয়। সংসদের প্রত্যেকটি আইন এবং সিদ্ধান্তের চুড়ান্ত ফরমানদাতা করা হয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে। এলএফও'র তৎলালীন সেই সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগও নাখোশ হয়। তারা কয়েকটি ধারার বিরোধিতাও করে। অথচ পরিহাস হ'ল ১৯৭৫ সাল, মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় উল্টো ঘুরে যায় খেলা। ঠিক বর্বর পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়ার মতোই একইভাবে সকল সিদ্ধান্তের চুড়ান্ত দাতা বনে যান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭০ সালের সেই এলএফও ছিল একটি কালাকানুন। পাকিস্তানের ইতিহাসের স্বৈরতন্ত্রের অনন্য এক নজির এই এলএফও। আইনি, কাঠামো এবং প্রচারের দিকসহ সব দিক থেকেই বাকশাল তথা ৪র্থ সংশোধনীর সাথে কোনো তফাত নেই। ৪র্থ সংশোধনীও একটি কালাকানুন। তবুও বাংলাদেশে একটি বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক বাকশালকে নির্লজ্জভাবে একটি আদর্শ রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে প্রচার করতে দেখা যায় । পাকিস্তান শাসন আমলে এলএফও'র বিরুদ্ধে বিপুলভাবে বিরোধিতা সম্ভব হলেও ৭৫ সালে বাংলাদেশে বাকশাল কিংবা ৪র্থ সংশোধনীর কঠোর বিরোধিতা করার সাহস কেউ পায়নি। কারণে এতে রক্ষিবাহিনী ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয় ছিল। দেশে তখন কায়েম হয়েছিল ভয়ের সংস্কৃতি। ফলে বাকশালের কিছুটা বিরোধিতা থাকলেও এটা নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ

আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। নানা পেশা নানা মতের মানুষ প্রাণের ভয়ে এবং সুযোগ-সুবিধা ও বাস্তবতার কারণে যুক্ত হয় বাকশালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে রীতিমতো জোর করে বাকশালে যোগদানের কাগজে সই করানো হয়। পরিহাস এই যে, ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হওয়ার পরও সে কারণেই বাকশালের সকল সদস্য একদম নিশ্চুপ ছিলেন। অপরদিকে বাকশালের একজন প্রতিষ্ঠিত সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর খন্দকার মোশতাক নিজেই ১৫ই আগস্ট বাকশাল বিলুপ্ত করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদেরকে সুর্য-সন্তান আখ্যায়িত করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নিজেই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হন!

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাকশালের কাঠামো ইয়াহিয়া খানের এল এফও এর চেয়ে অনেক বেশি ফ্যাসিস্ট। ভোটডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতা নিয়ে বাকশাল কায়েমের আয়োজনকে অনেক রাজনৈতিক নেতাই ভালোভাবে নিতে পারেন নাই।

বাকশাল সম্পর্কে সিরাজ শিকদারের মন্তব্য।।

বিপ্লবী ধারার রাজনৈতিক নেতা যিনি আওয়ামী লীগের বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন, সিরাজ সিকদার লিখেছেন,
পূর্ব বাংলার বর্তমান সংবিধান প্রণয়নকারীরা হচ্ছে দেশ বিক্রেতা, বিশ্বাসঘাতক ও মিরজাফর। পূর্ববাংলার জনগণের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার তাদের নেই।
তথাকথিত গণপরিষদ সদস্যরা ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সামরিক দস্যুর নির্বাচনী কাঠামোর নির্দেশ (L. F.O) মেনে নিয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

নিবাচনী কাঠামোর নির্দেশের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানী সংহতি মেনে চলার কথা। কাজেই এরা পাকিস্তানের সংহতি মেনে নির্বাচিত হয়েছে। এ কারণে পাকিস্তানের সংহতি মেনে নির্বাচিত ব্যক্তিরা কিভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার সংবিধান তৈরি করতে পারে! পূর্ববাংলার সংবিধান তৈরির জন্য তারা নির্বাচিত নয়"।[৪৮]

এম এ জি ওসমানী।।

বাকশাল গঠনের প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে গিয়ে বলেন,
"সংবিধানের আমূল পরির্বতনের জন্য গৃহীত সংশোধনীর পক্ষে আমি ভোট প্রদান করিনি।

ক. তা করলে আমি আমার বিশ্বাস ও বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতাম।

খ. এই সংশোধনীর অর্থ হল, জনগণের কাছে প্রদত্ত আমাদের দীর্ঘ দিনের প্রতিশ্রুতি এবং বস্তুত জনগণ ১৯৭৩ সনের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু অনুমোদন করেছে, তার সাথে প্রতারণা করা।

● উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য আগামী ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ সালে এই সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে আমি তাতে সম্মতি প্রদানে অক্ষম। সংসদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে একটা অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা এড়ানোর জন্যই আমি বিনয়ের সঙ্গে একযোগে সংসদ সদস্য পদ ও দলীয় সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করছি"।[৪৯]

৪৮. ছয় পাহাড়ের দালাল, আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের দেয়া সংবিধান প্রসঙ্গে, অক্টোবর ১৯৭২, নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী, সিরাজ শিকদার, পৃষ্ঠা, ১১৭
৪৯. ভাসানী-মুজিব-জিয়া (১৯৭২-১৯৮১) লেখক- জিবলু রহমান, পৃষ্ঠা-২২৬

আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী গোলাম মুরশিদ লিখেছেন,

"তিনি হয়তো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দীর্ঘ সময় ধরেই ভেবেছিলেন। কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে কি-না, সেটা নিয়ে সম্ভবত তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাতেও ছিলেন। এর মধ্যেই এই নবীন দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পার করেছে। চারিদিকে সমস্যা, দলের লোকজন বেপরোয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বিষহ, মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তায় তখন ভাটার টান। এমন সময় তিনি একদলীয় 'বাকশাল' প্রবর্তন করলেন। সারা জীবন তিনি বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে, অবশেষে কেন একদলীয় ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেটার বস্তুনিষ্ঠ কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় (?)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও জানতেন না, তিনি কার সাথে পরামর্শ করে 'বাকশাল' গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন"।[৫০]

বাকশালের মূল কথা ছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে, তার নাম হবে, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে বাকশাল। মূল কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। আর ১১৫ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশিষ্ট ছিল এই দলটি। সাধারণ সম্পাদকসহ এই ১৫ জন সদস্যের সকলকে চেয়ারম্যানই মনোনিত করবেন। পার্লামেন্ট নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তাকে চ্যয়ারম্যান অর্থৎ শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিতে হবে। চেয়ারম্যান ইচ্ছে করলে গঠনতন্ত্র পাল্টাতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানই হবেন গঠনতন্ত্রের একমাত্র ব্যাখ্যাদানকারী। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রওনক জাহান একদলীয় শাসন বাকশাল সম্পর্কে লিখেন,

Finally, in January 1975, through the fourth amendment of the constitution, passed by the first elected parliament, drastic changes were brought about. A presendential form of government and a single party system was introduced. The single party was named the Bangladesh Krishak Shramik Awami League (BAKSAL). All political parties including the AL were dissolved and their members were asked to join the BAKSAL. A few parties such as the Communist Party of Bangladesh (CPB) and the Muzaffer Ahmed-led faction of the NAP, both sympathetic to the USSR world view, along with Jatiya League led by the former chief minister, Ataur Rahman Khan joined BAKSAL. But other left groups wooed by Mujib to join BAKSAL such as the JSD stayed out of BAKSAL".[51]

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম হয় এবং তাতে সংসদীয় পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা ও আইন ও বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্পন করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠেন নির্বাহী, সংসদ ও বিচার বিভাগ তথা সরকারের তিনটি বিভাগেরই একচ্ছত্র কর্ণধার।

এসময় পশ্চিবঙ্গ সরকারের এককালের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র বোম্বের খ্যাতনামা পত্রিকা 'The economic and political weekly' তে লিখেন,"As far as civil liberties are concerned, Sheikh

৫০. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২০৬
51. Political Parites in Bangladesh Challenges of Democratization, Authored by Rounaq Jahan, Page no: 20-21

Mujibur Rahman's Second Revolution in Bangladesh has lighted the way to dusty death'.[52]

শেখ মুজিবের এই উল্টো যাত্রায় তার আশপাশের কিছু চাটুকার ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর বঞ্চিতরা এই প্রক্রিয়ায় দেশ চলতে থাকলে নিজেরা কোনোদিন ক্ষমতার স্বাদ পাবেন না ভেবে বাকশাল কায়েমের বছরেই ১৫ আগষ্টেই ঘটে জঘন্য হত্যাকাণ্ড। স্বপরিবারে নির্মমভাবে কিছু বিদ্রোহী সেনাদের হাতে নিহত হন শেখ মুজিবুর রহমান। এবং ক্ষমতায় আসেন আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ। শেখ মুজিবের একান্ত ঘনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোস্তাক বসে পড়েন ক্ষমতার মসনদে। পর পর কাউন্টার ক্যুতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। দেশপ্রেমিক সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের দায়িত্ব ভার বর্তায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপর এবং তিনি দেশকে একনায়ক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে গণতন্ত্রের ধারাতে ফিরিয়ে আনেন। প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের।[৫৩]

শেষ কথা।।

আজকের দিনে বাকশালকে বুঝতে পারা খুবই জরুরি রাজনৈতিক কাজ। আওয়ামী লীগ শুধু দেশকে অন্যায়ভাবে দখল করে সন্ত্রাসের রাজত্বই কায়েম করেনি। আওয়ামী লীগের ইতিহাস হলো, ইতিহাস দখলের ইতিহাস। এরা আমাদের ইতিহাসও দখল করে নিয়েছে। তাই প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে এবং সত্যকে হাজির করতে হবে। বর্তমানে এই বাকশালী চক্রটিই গণতন্ত্রকে হত্যা করে জারি করেছে ফ্যাসিবাদ। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রের কবর দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারা পুনরায় এক দশকের অধিককাল থেকে গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মিথ্যা মামলা ও হামলা, নির্লজ্জ দলীয়করণ, দুঃশাসন, অপশাসন, দুর্নীতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ স্বৈরশাসনের মাধ্যমে মধ্যরাতে ভোট ডাকাতি করে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে আছে। এদেরকে হটিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন বিকল্প নেই।

৫২. মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ইতিহাসের পুনর্পাঠ, আলতাফ পারভেজ, পৃষ্ঠা- ১৪২
৫৩. ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর: সিপাহী-জনতার বিপব ও বাংলাদেশের নবজন্ম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি।

পরিশিষ্ট-

১। 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কর্তৃক পেশকৃত বক্তব্য।

১৯৭৫ সালের গণতন্ত্রকে হত্যা ও বাকশাল সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিএনপির ২০২০ সালে আয়োজিত বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

তাং ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, স্থান- বিএনপির'র গুলশান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আজকের এই দিনটি হ'ল বাংলাদেশের ইতিহাসের কলংকতম দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা ১৯৭২ সালের সংবিধানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেশে একদলীয়, একনায়কতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী একটি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। এটা ছিল জনগণের সাথে সরাসরি এক বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিক এবং গণতান্ত্রিক সংকটের জন্য মূলত দায়ী হ'ল ১৯৭৫ সালে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ২৪ বছর এ দেশে কোটি কোটি মানুষ সংগ্রাম করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জেলজুলুম, অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ও শোষণ ও বৈষম্য থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছে। ১৯৫২ সালে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্টভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো অনেকে ঢাকার রাজপথে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। সেই থেকে শুরু হয় বাঙালী জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলন। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৫৪ সালে ঐক্যবদ্ধ বাঙালীরা তিন জাতীয় নেতা- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে জনগণের আশা আকাঙ্খা সম্বলিত ২১ দফা দাবির পক্ষে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে একটি নীরব বিজয় অর্জন করেন। এরপর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান- এই সবই ছিল সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলন। এ দেশের মানুষ তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কোনোদিন আপোষ করেনি।

১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে অনুষ্ঠিত একমাত্র জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তনের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয়যুক্ত করে সারা পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সাহায্য করে। কিন্তু এই বিজয় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি। তারা বন্দুকের নল দিয়ে জনগণের এই রায়কে পরাজিত করতে চেয়েছিল এবং সে জন্য ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে তাদের বর্বর সেনাবাহিনী দেশের নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষের ওপর গোলাবারুদ, কামান দিয়ে আক্রমণ চালায়। সেই সংকটময় সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দরা দেশের জনগণকে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না দেয়ার কারণে একটি বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা ও সংকট দেখা দেয়। সেই প্রেক্ষাপটে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামর কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে অসীম সাহসী এবং

দেশপ্রেমিক এক সৈনিক মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা তিনি আবার ৩০ মার্চ নতুন করে ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, যেই যুদ্ধে হাজার হাজার তরুণ ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, মজুর এবং সকল শ্রেণির মানুষ গ্রামে গঞ্জে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা তখন ভারতের শরনাপন্ন হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা, ১৯৬৯ সালের ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা , ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতা সনদ এবং রক্ষক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ- সবকিছুই ছিল জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের অংশ, যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল

১. দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।
২. একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
৩. দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ব্যক্তির উর্ধ্বে আইন এবং প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য পাবে।
৪. একটি স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নাগরিকের সুবিচার নিশ্চিত করা।
৫. সকল শ্রেণির মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।
৬. দেশে একটি সুষম প্রগতিশীল অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে সকল নাগরিকের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্য এবং আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের যে সংবিধান রচনা করে তার মধ্যে উপরোক্ত সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই সংবিধানে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য আরো দুটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন:

১. বিনা বিচারে কোনো নাগরিককে কোনো নিরাপত্তামূলক আইনের আওতায় আটক করা যাবে না।
২. দেশে কোনো অবস্থাতে জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে না।

সেই সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাগরিকদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে একটি বিরাট সমর্থন জানায় এবং ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগকে ২৯১ টি আসনে জয়ী করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের এই সৌন্দর্য বিনষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং মাত্র ছয় মাস যেতে না যেতেই ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীনে বিনা বিচারে আটক করার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সংবিধানের ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করার ব্যবস্থা করে। এই সংশোধনীর ফলে ১৯৭৪ সালে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' প্রণয়ন করে দেশের বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীদের বিনা বিচারে আটক করে এবং এই আইনকে

বিরোধী দল এবং মতকে দমন করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর জনমনে ভয়ভীতি, আতঙ্ক সৃষ্টি করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এর ২৭ দিন পর ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালের আজকের এই দিনে নিজেদের রচিত সংবিধানকে ধ্বংস করে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল মূল্যবোধ ও চেতনা ধূলিসাৎ করে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, ৪টি সংবাদপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধসহ বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধঃস্তন করা হয়। সেই দিন বিনা বিতর্কে বিনা আলোচনায় সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল মাত্র এগার মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে দেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী রাষ্টপতির পদে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই দলের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা খন্দকার মোস্তাক আহমেদ কিছু সামরিক অফিসারের মাধ্যমে জাতির জনককে হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং দেশে জারি করে 'মার্শাল ল'। কিন্তু চারজন ছাড়া সংসদ এবং মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের সকল সদস্যই নিজ নিজ পদে থেকে গেলেন। সেই সরকারের সমর্থনে আওয়ামী লীগের ৪ জন নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয় এবং তাদের এই হত্যাকাণ্ডে অপরাধ মওকুফ করার জন্য Indemnity ordinance তারা জারি করেন।
এরপর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণে ক্ষমতার হাতবদল দেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি। যার ফলে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের সিপাহী জনতার একটি স্বতস্ফুর্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এবং জনপ্রিয় স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাসীন করা হয়। শহীদ জিয়া ক্ষমতায় আরোহণ করার পরপরই দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সকল মৌলিক অধিকারসহ সংবাদপত্র ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পুনর্বহাল করেন।
দেশে দুইটি মিলিটারি শাসনের পর ১৯৯১ - ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তা পরবর্তীতে সেনা সমর্থিত একটি তত্বাবধায়ক সরকার পূর্বপরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে যাতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করা হয়। এরপর একই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে আরো দুটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করা হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গত ১১ বছর আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করে একদলীয়ভাবে দেশ চালিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে প্রবর্তিত বাকশাল ব্যবস্থাকে পরোক্ষভাবে কায়েম করেছে।

দেশে এখন কার্যকর কোনো সংসদ নেই। আইনের শাসন নেই। বিচার বিভাগ এবং গণমাধ্যে-মর স্বাধীনতা নেই। বলতে গেলে ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার পর দেশে তেমন কোনো রাজনীতি ছিল না, এখনও দেশে কোনো রাজনীতি নেই। ১৯৭৫ সালে সংবিধান সংশোধন কণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল আর এখন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুকৌশলে সেই একই ব্যবস্থ অনানুষ্ঠানিকভাবে চলছে। গণতন্ত্রের

আবরণে আজকে দেশে সৈরতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের আর্বিভাব ঘটিয়েছে।
বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই ব্যবস্থা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। তাই সেই গণতান্ত্র তারা ফিওে পেতে চায়। স্বাধীনতা, মক্তিযুদ্ধেও চেতনা এবং মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব এখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উপর জনগণ অর্পণ করেছে। একদলীয় শাসন ধেকে শহীদ জিয়া কর্তৃক বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং পরবর্তীতে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশে সংসদীয় গণদন্ত্র প্রবর্তন কওে গণতন্ত্রেও পূর্ণঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছিল। আজকে সেই গণতন্ত্র আমাদের নাই।
আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে একটা মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে নিষ্ঠুর এবং অমানবিকভাবে কারাবন্দি কওে রাখা হয়েছে। গণাতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি আজ একই সূত্রে গাঁথা। আজকের এই দিনে কাতির প্রত্যয় হলো- দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বহাল করার জন্য সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল-মত-শ্রেণি, বুদ্ধিজীবি, পেশাপজীবি, প্রমজীবি, ছাত্র-যুবক সকল শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা এবং গণতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্যাহ বুলু, শামসুজ্জামান দুদু ও শওকত মাহমুদ প্রমুখ।

২। সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী ও বাকশাল

(১৯৭২ সালের সংবিধান এবং ৪র্থ সংশোধনী)

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের নজরদারিতে দেশের সংবিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের নজরদারিতে দেশের সংবিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছিল। জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল।

4th Amendment to the Constitution and BAKSAL

সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী ও বাকশাল

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের (চতুর্থ সংশোধনী) আইন গৃহীত হয়। এই সংশো-ধনীর ফলে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই দলের নাম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)।

সংবিধানের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এটা একটা মারাত্মক আঘাত বলে অনেকে মনে করেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের উপর যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয় এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ সংবিধান করে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক আদালত ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়, রাষ্ট্রপতিকে অস্বাভাবিক রকমের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং কোনরুপ চেক ও ব্যালান্সের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন-

প্রথমতঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানে একজন প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু, ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রবর্তন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানে, মন্ত্রীপরিষদ তার কার্যকলাপের জন্য সরাসরি সংসদের নিকট দায়ী থাকতো। কিন্তু, চুতুর্থ সংশোধনীর পর মন্ত্রী পরিষদ সংসদের নিকট দায়ী না থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকে।

তৃতীয়তঃ চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে মন্ত্রীসভা জাতীয় সংসদের দ্বারা গঠিত হতো। কিন্তু, চতুর্থ সংশোধনীর পর মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে জাতীয় সংসদের সদস্য হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই।

চতুর্থতঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে ১০২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা রুজু করার অধিকার ছিল। কিন্তু, চতুর্থ সংশোধনীর পর এরুপ মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংসদীয় আইনের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক আদালত ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

পঞ্চমতঃ চতুর্থ সংশোধনী জারী হবার পূর্বে সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্য কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এরুপ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন।

ষষ্ঠতঃ চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে সংসদীয় শাসন পদ্ধতি চালু ছিল বিধায় তখন সকল নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রীসভা তথা প্রধান মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রপতি ছিল নামমাত্র প্রধান। কিন্তু, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি চালু হবার পর সকল নির্বাহি ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হয়। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে এবং বাহির থেকে রাষ্ট্রপতি তার নিজের ইচ্ছেমত মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগ করতে পারেন।

সপ্তমতঃ চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একাধিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করত এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতো। কিন্তু, চতুর্থ সংশোধীর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় এবং এই সংশোধনীর ১১৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একে 'জাতীয় দল' বলা হয়।

এভাবে, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আদি সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়।

বাকশাল (BAKSAL)

চতুর্থ সংশোধনী আইন দীর্ঘদিনের লালিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর গুরুতর আক্রমণ করেছিল। এই বিপ্লব ছিল সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মৃত্যু, যেখানে রাজনৈতিক মতামতের মুক্ত মত প্রকাশকে প্রাণবন্তের মতো লালন করা হয়েছিল, কারণ এটি দেশকে একটি অজানা

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিল। পাকিস্তান আমলে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এমন অত্যন্ত মূল্যবান সংসদীয় সরকারকে আবার রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কেবল একটি রাজনৈতিক দলকেই কাজ করতে দেওয়া হয়ে ছিল।

এই নতুন ব্যবস্থায় মুজিবের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি হন, মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য একটি ঘোষণা দেওয়া হয়। মনি সিংহ এর আওয়ামী লীগ এবং মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং মোজাফফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি সমন্বিত একটি নতুন রাজনৈতিক দল।

১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর মুজিব তাঁর রেডিওতে প্রচারিত বক্তব্যে বলেছিলেনঃ "আওয়ামী লীগ একদলীয় ব্যবস্থা গঠনের জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রয়াসকে অস্বীকার করার জন্যই রুপ নিয়ে ছিল। আমরা এভাবেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করি।"
আতাউর রহমান খানসহ বাকশালে বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা যোগ দিয়েছিলেন। যদিও ৮ ই মার্চ মাওলানা ভাসানী মুজিবের 'দ্বিতীয় বিপ্লবকে' সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু তিনি নতুন দলে যোগ দেননি। জেনারেল ওসমানী দেশে এক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত উভয়ই বাকশালের পক্ষে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। ৭ জুন, রাষ্ট্রপতি মুজিব বাকশালের একটি ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন।

২২ জুন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ৬০ টি নতুন জেলা ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে এবং প্রতিটি জেলা প্রশাসকের অধীনে একটি জেলা থাকবে। মুজিব ২১ জুলাই ৩৩ সংসদ সদস্য, ১৩ জন বেসামরিক কর্মচারী, সেনা কর্মকর্তা, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং উপজাতি প্রধানদের সমন্বয়ে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরদের ২৭ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন।

মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য, সরকার ১৬ই জুন অধ্যাদেশ জারি করে এবং সরকার পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি, The Daily Observer এবং দৈনিক বাংলা ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়। আরও ঘোষণা করে যে, এটি দৈনিক ইত্তেফাক এবং বাংলাদেশ টাইমসকে গ্রহণ এবং প্রকাশ করবে।

সর্বোপরি, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, খন্দকার মোশতাক আহমেদ একদলীয় পদ্ধতিকে বাতিল করে এবং বাকশাল গঠন অকার্যকর ও বাতিল ঘোষণা করে।

৩। "চতুর্থ সংশোধনী ছিল সংবিধান পরিপন্থী"

(মিজানুর রহমান খান)

০৩ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একযোগে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন যে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনী ছিল সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। জিয়াউর রহমানের সামরিক ফরমান নয়, বরং চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারাই সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদের ক্ষমতা খর্ব করে বিচারক অপসারণের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল। আর সেই ব্যবস্থা বিচার বিভাগের

স্বাধীনতার জন্য হুমকি বিবেচনা করে এবং তার তুলনায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে 'অধিকতর স্বচ্ছ' পদ্ধতি বিবেচনায় আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীর মামলার রিভিউতে তা মার্জনা করেছিলেন। ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার যে পূর্ণাঙ্গ রায় মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে আপিল বিভাগের সাতজন বিচারপতিই এই পর্যবেক্ষণে একমত পোষণ করেন।

উলেখ্য, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদে গৃহীত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় (বাকশাল) শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

রায়ে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার সুচিন্তিতভাবে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধানটি সংবিধানে রেখে দেয় এবং অন্য অনেক বিধানের মতোই ৯৬ অনুচ্ছেদকেও সংবিধানের অপরিবর্তনীয় মৌলিক কাঠামো হিসেবে ঘোষণা করে। তাই জিয়ার সামরিক ফরমান নয়, বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণের লক্ষ্যে প্রণীত ষোড়শ সংশোধনীটি ছিল পঞ্চদশ সংশোধনীর পরিপন্থী।

বিচারপতি আবদুল ওয়াহাব মিয়া লিখেছেন, সংসদ সদস্যদের নজরে এটাও আনা হয়নি যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিজেই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক অভিসংশনের ক্ষমতা রহিত করেছিলেন। তিনি ওই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করেছিলেন।

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন লিখেছেন, চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা বিচারক অপসারণের প্রক্রিয়া মৌলিকভাবে পরিবর্তিত (মেটারিয়ালি এফেক্টেড) হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনী চ্যালেঞ্জ না হওয়ার কারণে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে একটি বৈধ সংবিধানের অংশ হিসেবে তা থেকে গিয়েছিল। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মনে করেন, চতুর্থ সংশোধনীর চেয়ে পঞ্চম সংশোধনী 'অধিকতর স্বচ্ছ' বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তা মার্জনা করেছিলেন। আর সেই মার্জনাসংক্রান্ত রায় সংবিধানের ১১১ ও ১১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। তাই ষোড়শ সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের লঙ্ঘন ঘটেছে।

বিচারপতি মো. ইমান আলী লিখেছেন, ৯৬ অনুচ্ছেদের বিষয়ে বলা যায়, '৭২-এর সংবিধান '৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংশোধিত অবস্থায় ছিল। সে সংশোধনী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদ কর্তৃক তৈরি করা হয়েছিল। আর ঘটনাক্রমে সেই সংসদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিচারপতি ইমান আলী লিখেছেন, সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে স্পষ্টতই সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছিল। এটা কৌতূহলপূর্ণ যে, '৭২-এ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ নিতেন। অথচ চতুর্থ সংশোধনীতে বিধান করা হলো, রাষ্ট্রপতি স্পিকারের কাছে শপথ নেবেন। এরপর সামরিক ফরমান দ্বারা পুনরায় বিধান করা হয় যে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির কাছেই শপথ নেবেন। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবার শপথ নেওয়ার বিধান স্পিকারের কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এর মানে, '৭২-এর সংবিধানে নয়, তারা ফিরে গেছে চতুর্থ সংশোধনীতে। সুতরাং সংসদের উদ্দেশ্য যদি '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া হয়, তাহলে প্রধান বিচারপতিরই উচিত রাষ্ট্রপতিকে শপথ পড়ানো।

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী তাঁর রায়ে সামরিক ফরমানগুলো অবিকল তুলে ধরে দেখিয়েছেন, এসব পরিবর্তন গোড়া থেকেই বাতিল বলে গণ্য। কিন্তু আপিল বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত তাকে মার্জনা করলেও তার 'বাতিল' চরিত্রের কোনো হেরফের ঘটেনি। এই

পরিস্থিতিতে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৯৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন ঘটে। সুতরাং আগের বাতিল বিধানটি বৈধ সংশোধন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হামলা ১৯৮২ সালে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তবে এখন সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটি বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গ।

বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার উল্লেখ করেছেন, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারক অপসারণের ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'আমি প্রধান বিচারপতির সব পর্যবেক্ষণ, মন্তব্যসহ তাঁর অভিমতের সঙ্গে একমত।'

পঞ্চদশ সংশোধনী ও সংসদের সামর্থ্য

রায়ে প্রধান বিচারপতি লিখেছেন, শুনানির সময়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনী তাড়াহুড়ো করে পাস করা হয়েছিল, সাবেক আইনমন্ত্রী বিষয়টিতে নজর দেননি। আদালত ওই যুক্তি গ্রহণ করেননি। বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য চাওয়া হলে তৎকালীন আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, এই অভিযোগ দুর্ভাগ্যজনক। খুব ভালোভাবে আলাপ-আলোচনার পরই ওই বিধান রেখে পঞ্চদশ সংশোধনী করা হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি ৮১টি সামরিক আইনকে সংসদে পাইকারি হারে গ্রহণ করার জন্য সংসদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে শফিক আহমেদ বলেন, এটা সঠিক নয়, এখানে সংসদের সামর্থ্যে প্রশ্ন আসে না।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার রায় ও তাঁর যাবতীয় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী ছয় বিচারকের মধ্যে তিনজনই শর্তহীন সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বাকি তিনজনের মধ্যে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীও অধস্তন আদালতের ওপর রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ১১৬ অনুচ্ছেদ যেহেতু এই মামলার প্রতিপাদ্য নয়, তাই তাঁরা এ বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। অপর বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণের কথা উলেখ না করে পঞ্চম সংশোধনী মামলায় ১১৬ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আপিল বিভাগের আশাবাদের পুনরুল্লেখ করেছেন।

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী জিয়াউর রহমান ও এরশাদের দুই সামরিক শাসনের সময়ে জারি করা ফরমান ও অধ্যাদেশগুলো নবম সংসদে অবিকল গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন যে এগুলো এই মামলার বিচার্য বিষয় নয়।

প্রধান বিচারপতি আরও লিখেছেন, 'আমরা যদি ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ দেখি, তাহলে এটা নগ্নভাবে ফুটে উঠবে, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র যেভাবে তাদের কাজ করা উচিত সেভাবে করতে পারছে না। সুপ্রিম কোর্ট সরকারের এক সিভিল রিভিউ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত অইনসমূহ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাময়িকভাবে মার্জনা করেছিলেন। আদালতের আদেশে বলা হয়েছিল, সংসদ যাতে ওই সময়ে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারে এবং আইনগুলোও তৈরি করতে পারে। অথচ সংসদ আদালতের নির্দেশনার লঙ্ঘন কিংবা আদালতের নির্দেশনার তাৎপর্য অনুধাবন করা ছাড়াই ২০১৩ সালে ৬ নম্বর আইন তৈরি করেছে।'

প্রধান বিচারপতি লিখেছেন, এর মাধ্যমে তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারি করা কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর করেছে। বিলে লেখা হয়েছিল, 'এ সময়ের যত অধ্যাদেশ তা এখন থেকে এমনভাবে কার্যকর থাকবে, যেন তা সংসদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে। তবে এভাবে তা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তা কোনোভাবেই অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সামরিক শাসনে কৃত কর্মের সমর্থন করেছে বলে গণ্য হবে না।' বিলের এই ভাষ্য তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি লিখেছেন, বিলের ওই বিবৃতি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সংসদ আইন প্রণয়নের পরিবর্তে ৮১টি (সামরিক) আইনকে সমর্থন ও অনুমোদন দিয়েছে। একইভাবে তারা ২০১৩ সালের ৭ নম্বর আইনের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বরের মধ্যে জারি করা অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করেছে। সংসদে আনা বিলে তারা উল্লেখ করেছে, সামরিক শাসনে জারি করা এসব 'আইনের শাসন ও জনস্বার্থে কার্যকর রাখা হলো।' ২০১১ সালের ৪৮ নম্বর দেওয়ানি আপিলে আপিল বিভাগ সংসদকে বাতিল করে দেওয়া আইনগুলোকে নতুন করে তৈরি করতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কারণ ওই আইনগুলো ক্ষমতা জবরদখলকারীরা প্রণয়ন করেছিল। এটা পরিহাস যে সংসদ তার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অপারগতার পরিচয় দিয়েছে।

তিনি বলেন, অধিকাংশ আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে মৌলিক অধিকারের বিষয় জড়িত রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ১৯৮২ সালের অ্যাকুইজেশন অ্যান্ড রিকুইজেশন অব ইমমুভেবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্সের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সামরিক জবরদখলকারীদের তৈরি করা আইন যা সর্বোচ্চ আদালত বাতিল করে দিয়েছেন সেগুলো তাঁরা অনুসমর্থন করেছেন। অথচ বাংলাদেশ সংবিধান সংসদকে এভাবে আইন গ্রহণ করতে কোনো এখতিয়ার দেয়নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আদালতে বসে এসব আইনের আওতায় বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে বিব্রত বোধ করতে হয়। তিনি বলেন, সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভের আগে তাঁদের বোঝা উচিত সংবিধান নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা তাঁদের পক্ষে আদৌ সম্ভব কি না।

৪। বাংলাদেশের সংবিধান (৪র্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫

(১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

১৯৭৫ সনের ২ নং আইন

[২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ-পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।– এই আইন সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর "সংবিধান" বলিয়া অভিহিত)-এর ১১ অনুচ্ছেদের "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। **সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন**।– সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ–

"৪৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ**।– এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সংসদ্ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।"।

৪। **সংবিধানের চতুর্থ ভাগের সংশোধন**।– সংবিধানের চতুর্থ ভাগে,

(ক) ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"১ম পরিচ্ছেদ–রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি

৪৮। **রাষ্ট্রপতি**।– (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন।

৪৯। **উপ-রাষ্ট্রপতি**।–বাংলাদেশের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৫০। **রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা।**—কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন ; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন ; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

৫১। **রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ।**— (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহার পদ হইতে পূর্বে অপসারিত না হইয়া থাকিলে উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) উপ-রাষ্টপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-রাষ্ট্রপতির স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ্-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ্-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপ-রাষ্টপতি নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। **রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।**— (১) এই সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেই জন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

৫৩। **রাষ্ট্রপতির অভিশংসন।**— (১) এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচারণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে ; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে ; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না, এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ্ আহ্বান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ্ কর্তৃক নিযুক্ত কোন ট্রাইব্যুনালের নিকট সংসদ্ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ্ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৪। **অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ**।– (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে ; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ্ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলিয়া অভিহিত)-গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ-জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ্ আহ্বানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ্ আহ্বান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবারকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ্ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৫। **অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি**।– (১) রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত শূন্যপদে নির্বাচিত নূতন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিবেন।

(২) কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি উভয়ের পদ শূন্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি উভয়েই অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত শূন্যপদে নির্বাচিত নূতন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) কোন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের কোন বিধান না থাকিলে সংসদ্ যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৫৬। **প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব**।– (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার অধীনস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা, তাহার আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করিবেন, উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

৫৭। **রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদির অধিকার**।– কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

২য় পরিচ্ছেদ–মন্ত্রী-পরিষদ

৫৮। **মন্ত্রী-পরিষদ**।– (১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শদানের জন্য একটা মন্ত্রী পরিষদ থাকিবে।

(২) পরিষদ বা মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না, এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৩) রাষ্ট্রপতি তাঁহার বিবেচনায় সংসদ্-সদস্যগণের মধ্য হইতে কিংবা সংসদ্-সদস্য হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি যেরূপ আবশ্যক মনে করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পরিষদের সদস্য হইবেন না।

(৪) রাষ্ট্রপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন অথবা তিনি ঐ সকল সভায় উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতিত্ব করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন মন্ত্রী স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।; এবং

(খ) ৩য় পরিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

৫। **সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।– সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে,–

(ক) (২) দফায়,–

(অ) (ঙ) উপ-দফায় সেমিকোলনের শেষে "অথবা" শব্দটা সংযোজিত হইবে ; এবং

(আ) (চ) উপ-দফা বিলুপ্তি হইবে ; এবং

(খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হইবে।

৬। **সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন**।–সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৭০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"৭০। পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া।–কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা।– যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া–

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোট দানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"।

৭। **সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর সংসদের অন্ততঃ দুইটা অধিবেশন হইবে।"।

৮। **সংবিধানে নতুন ৭৩ক অনুচ্ছেদের সংযোজন।**— সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ৭৩ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে ঃ

"৭৩ক। **সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার।**— (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ-সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না।

(২) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রধান মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।"।

৯। **সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (৩) দফার "রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের (১) দফার "সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১১। **সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় "সম্মতিদান করিবেন" শব্দগুলির পর "কিংবা তাহাতে সম্মতিদানে বিরত রহিলেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

১২। **সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের (ক) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা সংযোজিত হইবে ঃ

"(কক) উপ-রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়,"।

১৩। **সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (১) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"(১) প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।"।

১৪। **সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের,—

(ক) (২) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"(২) অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিচারককে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে অপসারিত করা যাইবে না।"। এবং

(খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হইবে।

১৫। **সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের "প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**— সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"১০২। **কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।**—(১) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেই জন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কোন অন্তর্বর্তী আদেশদানের বা এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃঙ্খলা বাহিনী-সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।"।

১৭। **সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের "আদালত ও ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আদালতের" শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।**— সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১১৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"১১৫। **অধস্তন আদালতে নিয়োগ**।—বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।"।

১৯। **সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।—সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের "সুপ্রীম কোর্টের" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতির" শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। **সংবিধানের নূতন ১১৬ক ধারার সংযোজন**।—সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ১১৬ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ১১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে ঃ

"১১৬ক। **বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন**।—এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।"।

২১। **সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।—সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের (১) দফার (গ) উপ-দফায় "৩" সংখ্যার পরিবর্তে "২" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। **সংবিধানে নূতন ষষ্ঠ-ক ভাগের সংযোজন**।—সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের পর নিম্নরূপ নূতন ষষ্ঠ-ক ভাগ সংযোজিত হইবে ঃ

"ষষ্ঠ-ক ভাগ

জাতীয় দল

১১৭ক। **জাতীয় দল**।—(১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে রাষ্ট্রে শুধু একটা রাজনৈতিক দল (অতঃপর জাতীয় দল নামে অভিহিত) থাকিবে।

(২) যখন (১) দফার অধীন কোন আদেশ প্রণীত হয়, তখন রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচী, সদস্যভুক্তি, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) (৩) দফার অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।

(৫) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যখন জাতীয় দল গঠিত হয়, তখন কোন ব্যক্তি—

(ক) যদি তিনি, যে তারিখে জাতীয় দল গঠিত হয়, সেই তারিখে, সংসদ্-সদস্য থাকেন, তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় দলের সদস্য না হইলে সংসদ্-সদস্য থাকিবেন না এবং সংসদে তাহার আসন শূন্য হইবে ;

(খ) যদি তিনি জাতীয় দলের দ্বারা রাষ্ট্রপতি বা সংসদ্-সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত না হন, তাহা হইলে অনুরূপ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না ;

(গ) জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন করিবার বা অনুরূপ দলের সদস্য হইবার কিংবা অন্যভাবে অনুরূপ দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।"।

২৩। **সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।—সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের (১) দফায়,—

(ক) "সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি পদের" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি-পদের ও সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) (খ) দফায় "এবং" শব্দটা বিলুপ্ত হইবে ; এবং

(গ) (গ) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (গ) এবং (ঘ) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি-পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।"।

২৪। **সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।—সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে,—

(ক) (১) দফার "ভোটাধিকার-ভিত্তিতে" শব্দটার পরে "রাষ্ট্রপতি-পদের ও" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে ; এবং

(খ) (২) দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা সংযোজিত হইবে ঃ

"(৩) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি (২) দফার অধীন কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটারতালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হন।"।

২৫। **সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে,—

(ক) (১) দফায়,—

(অ) "নব্বই দিন" শব্দগুলি পরিবর্তে "একশত আশি দিন" প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(আ) শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে ;

(খ) (২) দফায় "নব্বই দিনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "একশত আশি দিনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। **সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন**—সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১২৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"১২৪। **নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা—

(ক) ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ ;

(খ) সংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ ;

(গ) নির্বাচন অনুষ্ঠান ; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনের জন্য এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ রাষ্ট্রপতি-পদের কিংবা সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"।

২৭। **সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের (১) দফার শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

২৮। **সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফার (ক) উপ-দফার পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা সংযোজিত হইবে ঃ

"(কক) উপ-রাষ্ট্রপতি,"।

২৯। **সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের (২) দফার "এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ সম্ভব না হইলে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩০। **সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিলের বিলোপ।**—সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত হইবে।

৩১। **সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে,—

(ক) ১ ফরমে "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্পীকার" শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) ১ ফরমের পর নিম্নরূপ নূতন ফরম সংযোজিত হইবে ঃ

"১ক। **উপ-রাষ্ট্রপতি।**—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।" ;"

(গ) ৩ ফরমে "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(ঘ) ৪ ফরমে "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটা প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(ঙ) ৫ ফরমে "সংসদের কোন বৈঠকে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩২। **চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।**—সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

৩৩। **প্রথম সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি।**—সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত সংসদ, রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে, এই আইন প্রবর্তন হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৩৪। **রাষ্ট্রপতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে,

(ক) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকিবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে ;

(খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রবর্তন হইতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদে বহাল থাকিবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপি

২৮/১, ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা, ফোন: ৯৩৬১০৬৪